মার্চ-এপ্রিল 1982

এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

- পৌরাণিক সৃষ্টিবাদ বনাম বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ
- ভারতীয় বিজ্ঞান-ঐতিহ্য পাঠের রূপরেখা
- ওষুধের কথা
- নিউট্রন বোমা
- গবেষণার নামে ষড়যন্ত্র
- কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার
- পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সার

পঞ্চম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল, 1982

সূচী—

		পৃঃ
সম্পাদকীয়		1
সৃষ্টিবাদ বনাম বিবর্তনবাদ : একটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই	—পার্থপ্রতিম মজুমদার	1
ভারতীয় বিজ্ঞান-ঐতিহ্য পঠনের রূপরেখা	—সত্যবান রায়	5
ওষুধের কথা	—সুখময় ভট্টাচার্য	9
জানবার কথা। নিউট্রন বোমা জিনিসটা কি ?		11
পরিক্রমা : একটি দরদী দৃষ্টিভঙ্গী স্বাস্থ্য নয় যুদ্ধ গবেষণা না আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ? ম্যালেরিয়া বাড়ছে বিপজ্জনকভাবে কীটনাশক না জননাশক ? মনোরোগীদের হাজত ছেড়ে নতুন ঠাঁই জলের ভাবনা মনোবিজ্ঞানীর বিচার	সন্ধানী	12
পর্যালোচনা : পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সারের ব্যবহার গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন ?		14
রিপোর্ট : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সাধারণ সভা ২য় নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির বিজ্ঞান আন্দোলন—একটি অভিজ্ঞতা		16

ভুল সংশোধন

বি-ও বি জানু-ফেব্রু, 1981 সংখ্যায় 'দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী : বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক' লেখাটিতে কয়েকটি ভুল ছিল : (1) পৃঃ 16 প্রথম কলাম, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, প্রথম লাইনে 'প্রথম বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ' এর বদলে হবে 'ইংরাজি ছাড়া বিদেশী ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ'; (2) ঐ পঞ্চম লাইনে 'গ্রন্থ'-এর বদলে হবে 'প্রবন্ধ'; (3) পৃঃ 16, দ্বিতীয় কলাম, প্রথম অনুচ্ছেদ—সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার খণ্ড 214, সংখ্যা 2-এ শুধু কোসম্বী ও মার্টিন গার্ডনারের লেখা দুটিই মুদ্রাবিস্তা বিষয়ক ছিল।

কোসম্বী বেঁচে থাকলে এই ভুলগুলির জন্য আমাদেরকে প্রচণ্ড বকুনী সইতে হত।

সঃ মঃ, বি-ও-বি।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4নং ফরম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি :

পত্রিকার নাম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা : বাংলা ও ইংরাজি

প্রকাশনার স্থান : 52/9 C বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-700012;

প্রকাশনার কাল : দ্বিমাসিক

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : রবীন মজুমদার, ভারতীয়, ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 92 আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-700009;

মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : ঐ

সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : পার্থ সেন, ভারতীয়, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া;

প্রেসের নাম ও ঠিকানা : মুদ্রাকর, 10/1C মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-700003;

আমি, রবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমর জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য।

স্বাঃ, রবীন মজুমদার
প্রকাশক,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা

সম্পাদকীয় । বিজ্ঞান আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে উঠুক।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভিতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার ও বোঝার এক নতুন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি আর সেগুলির বেশ কয়েকটির প্রচারের মাত্রা এর প্রমাণ। অবশ্য বহুল প্রচারিত বিজ্ঞানের পত্রিকার অনেকগুলিই বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত। তবু এগুলির প্রচার থেকে অন্তত একথা বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের বিষয়ে মানুষের আগ্রহ কম নয়। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত সংগঠন, ক্লাব, গোষ্ঠী ইত্যাদির কাজ-কর্মেরও প্রসার ঘটছে যথেষ্ট মাত্রায়। গণবিজ্ঞান আন্দোলন কথাটি শোনা যাচ্ছে প্রায়ই। পশ্চিমবঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজকর্ম চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন অনেকে। এ ধরনের কাজকর্ম অতীতে ছিল না একথা বলা অবশ্য ভুল হবে। তবে সময়ের সাথে সাথে একটি নতুন দিকের গুরুত্ব ক্রমশ অনুভূত হচ্ছে আগের চাইতে বেশী মাত্রায়। নিছক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সর্বসাধারণের বোঝার উপযোগী করে পরিবেশন করাই নয়, বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ও ব্যাপক প্রয়োগের পথে সামাজিক – আর্থনীতিক বাধাগুলিকে চিহ্নিত করা আর সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হওয়া—এই দিকটি নিয়ে আজকের কর্মীরা ভাবছেন আগের চাইতে বেশী করে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের বিস্ময় জাগানো অগ্রগতি আর সস্ত বনার পাশাপাশি সামাজিক সঙ্কটের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা দেখে বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে মানুষের মনে গভীর প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। এর আগে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা এই দিকটি নিয়ে ঠিক এতটা ভাবিত হন নি। আবার সামাজিক—রাজনীতিক আন্দোলনের কর্মীরাও জনজীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা ও তাৎপর্যের দিকটিকে গুরুত্ব দেন নি উপযুক্ত পরিমাণে। সামাজিক আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিজ্ঞানের এই বিচ্ছিন্নতা ক্ষতি করেছে বিজ্ঞানের, দুর্বল করেছে আন্দোলনকে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাবে বার বার ব্যাহত হয়েছে সামাজিক আন্দোলনের গতি।

তাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, বিজ্ঞান আন্দোলন যুক্ত হোক সামাজিক আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে।

সৃষ্টিবাদ বনাম বিবর্তনবাদ ঃ একটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই

মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাকে কয়েক শতক পিছনে ফেলে এসেও আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক' মানসিকতা মুক্ত হতে পারে নি সে চিন্তাধারার প্রভাব থেকে। কিছু কিছু সনাতনী ধ্যানধারণা নতুন কলেবরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে এই বিংশ শতাব্দীতেও। এরকমই একটি ঘটনা সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেল খোদ মার্কিন মুলুকে, বিজ্ঞান আর কারিগরির বন্যাও যেখানে ঠেকাতে পারেনি প্রাগৈতিহাসিক অপজ্ঞানের জোয়ার। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর প্রাণীজগতের সৃষ্টি তথা বিবর্তনের যে তত্ত্ব গড়ে তুলেছে তাকে আদালতের সম্মুখে রীতিমত লড়াই করতে হল পুরাণ-কথিত সৃষ্টিবাদ (creationism) এর বিরুদ্ধে। ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপাতত আধুনিক বিজ্ঞানের জয় হলেও লড়াই শেষ হয়নি। প্রতিপক্ষ যথেষ্ট প্রবল।

'বাঁদর-মামলা' 'উনিশ শ' পঁচিশ ঃ উনিশ শ' পঁচিশ সালে আমেরিকার টেনেসি প্রদেশে স্কোপ্‌স নামে এক তরুণ স্কুল শিক্ষকের চাকরী যায়। তার অপরাধ সে তখনকার বিবর্তনবাদ-বিরোধী আইন ভেঙে ছাত্রদেরকে বিবর্তনবাদ পড়িয়েছিল। মামলা উঠল আদালতে। আদালত রায় দিল বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে। বিবর্তনবাদ-বিরোধী আইন তার পর চালু ছিল 1967 পর্যন্ত। '67তে গ্যারী স্কট নামে আর একজন স্কুল মাষ্টারের চাকরী যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রত্যাহৃত হয় এই আইন।

আর উনিশ শ' একাশি - ছাপান্ন বছর পর অনুষ্ঠিত হ'ল আর এক ঐতিহাসিক মামলা। এবারের পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য একটু ভিন্ন। আজকের সৃষ্টিবাদীরা সরাসরি বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে না। তবে তাদের দাবী বিবর্তনবাদের পাশাশাশি সৃষ্টিবাদও পড়ানো হোক ক্লাশঘরে, স্থান পাক পাঠ্য বইয়ে। এই ধরনের 'পক্ষপাতহীনতা' বিল আকারে গৃহীত হয়েছে আমেরিকার কুড়িটি প্রদেশে। 1981-র 19 শে মার্চ এই বিলটি আরকানসাস প্রদেশে আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেনটে বিলটি পেশ করা হয় তৎকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার ঠিক প্রাক্‌কালে, যার ফলে এটির উপর কোন বিতর্কই হতে পারে নি। রাজ্যপাল ফ্রাঙ্ক কোয়াইট পরে স্বীকার করেন

যে তিনি বিলটি সই করেছিলেন সেটিকে না পড়েই। লুইসিয়ানাও অনুরূপ একটি আইন পাশ করে। আরকানসাসের পর পরই। আরকানসাসে 'পক্ষপাতহীনতা'র বিলটি আইন হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরই আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU) এর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ পেশ করে। ACLU-এর বক্তব্য, এই আইন মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর (1791 এর ডিসেম্বর মাসে মূল মার্কিন সংবিধানের দশ দফা সংশোধনী গৃহীত হয়) পরিপন্থী। প্রথম সংশোধনীতে বলা আছে রাষ্ট্র আর গীর্জা (অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা)-কে পরপস্পরের থেকে আলাদা রাখতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ এটি।

এই মামলা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। রিগান প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি আর সৃষ্টিবাদীরা জোর গলায় তাদের বক্তব্য প্রচার শুরু করেছিল। রিগান নিজেই এদের প্রতি সমর্থনের প্রমাণ রেখেছেন। এই কিছুদিন আগেই ডালাসে গীর্জার বড় বড় ধর্মযাজকদের সম্মুখে তিনি বলেছিলেন যে বিবর্তনবাদ একটা "তত্ত্ব মাত্র", আর "সম্প্রতি বিজ্ঞানের জগতেই এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে"। তিনি এও বলেছিলেন যে "এটি যদি স্কুলগুলিতে

বাঘা বিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে কি ব'লছেন?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ও তাঁর গণিতজ্ঞ সহকর্মী য়িক্রমসিংঘে সম্প্রতি 'ইভোলিউশন ফ্রম স্পেস' বইটি লিখে চারদিকে বেশ হৈ চে ফেলে দিয়েছেন। এক শ' ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার এই বইটিতে ডারউইনবাদ তথা বিবর্তনবাদকে মনের সুখে নস্যাৎ করেছেন এই দুই বিজ্ঞানী। আর তার জায়গায় খাড়া করেছেন বহির্বিশ্ব থেকে প্রাণ আমদানির তত্ত্ব। বইটির বক্তব্য একটু বিশ্লেষণ ক'রলে কিন্তু বাঘা বিজ্ঞানীদের উদ্ভট অজ্ঞতাই প্রকট হ'য়ে ওঠে। ডারউইনকে এঁরা অভিযুক্ত ক'রেছেন চৌর্যবৃত্তির দায়ে, আর ডারউইনবাদীদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, এঁরা সেই চৌর্যবৃত্তি মেনে নিচ্ছেন বলে। এই কদর্য অভিযোগের ভিত্তি হ'ল "লোরেন আইসলী'র 1959 সালের সাহসী প্রবন্ধ"টি যাতে বলা হ'য়েছিল ডারউইন নাকি এডওয়ার্ড ব্লিথ-এর তত্ত্ব চুরি ক'রে নিজের নামে চালিয়ে ছিলেন। তার পরের কুড়ি বছরের অনুসন্ধানগুলি যে নিঃসংশয়ে এই অভিযোগটি খণ্ডন করেছে সেটুকু জানার মতও পরিশ্রম করতে রাজি নন বাঘা বিজ্ঞানীরা। বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আরো বড় অভিযোগ অঙ্ক কষে হাজির করেছেন এঁরা। একটি জীবকোষের সমস্ত প্রোটিন অণুগুলিকে যদি অ্যামিনো অ্যাসিড এককগুলির আকস্মিক সমন্বয়ে তৈরী হ'তে হয় তবে তার সম্ভাব্যতা 10^{40000} এর 1 ভাগ মাত্র। সুতরাং এ ভাবে জীবকোষ তৈরী হতেই পারে না। অর্থাৎ বিবর্তনবাদ ভুল। পদার্থবিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞরা সামান্য পড়াশুনা করেই জীবনবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য ফলাতে চাইলে বোধহয় এরকমই হয়। প্রোটিন অণুগুলি কিভাবে তৈরী হ'ল বিবর্তনবাদ অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা করার পথে বহু সমস্যা রয়েছে এটা নতুন কথা নয়। কিন্তু এই সমস্যাগুলিকে ঘিরে আজকের দিনে যে ব্যাপক ও গভীর গবেষণা চ'লছে, যে গবেষণাগুলি ক্রমশ বিবর্তনবাদের মূল বক্তব্যেরই সমর্থন যোগাচ্ছে, তা জানা বা বোঝা হয়েল বা তাঁর সহকর্মীর পক্ষে কিছুই শক্ত ছিল না। যদি অবশ্য তাঁরা প্রথমেই এক লাফে এক সাড়া জাগানো তত্ত্ব হাজির করার জন্য এত ব্যাকুল না হতেন। এই উদগ্র ব্যাকুলতা থেকেই প্রোটিন অণু বা জীবকোষ গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার **সমস্যাকে** বিবর্তনবাদের **ব্যর্থতা** হিসেবে দেখিয়ে তাঁরা সোজা চ'লে গেছেন উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে যেখানে দানিকেন আর হয়েলের ভিতর পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণীরা নাকি আদি জীবকোষ ছড়িয়ে দিয়েছিল মহাশূণ্যের বুকে তড়িৎচুম্বকীয় বিকীরণের মাধ্যমে যা শেষ পর্যন্ত উল্কাপিণ্ড জাতীয় কিছুতে করে পৌছেছিল পৃথিবীতে। এখন, মহাশূণ্যের বুকে আদি জীবকোষের উৎপত্তি অসম্ভব কিছু নয়। অনেক বিবর্তনবাদীও তর্কের খাতিরে মেনে নিতে রাজি হবেন এ সম্ভাবনা। তবে এটা প্রাণের উৎপত্তির **ব্যাখ্যা** জোগায় না, উৎপত্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্রটিকে আরো প্রশস্ত করে মাত্র। হয়েলরা যদি শুধু এটুকু বলতেন তবু নাহয় বোঝা যেত। কিন্তু এর ওপর আবার তাঁ'দের বক্তব্য যে এই আদি জীবকোষ তৈরী ক'রেছিল মহাজাগতিক কোন বুদ্ধিমান প্রাণী। কষ্টকল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন। আর কষ্টকল্পনার কথা বাদ দিলেও প্রশ্ন থাকে, নতুন কি ব্যাখ্যা ক'রতে চাইছেন হয়েল এই 'তত্ত্ব' দিয়ে? মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী এলো কি ভাবে তা না জানলে সমস্যার যে সত্যিকারের কোন সমাধানই হ'ল না তা কি ব'লে দিতে হবে ফ্রেড হয়েলকে, যে হয়েল পদার্থবিজ্ঞানে একাধিক অসাধারণ অবদান রেখেছেন? অবশ্য বইটি শেষ করার দু' পাতা আগে এই সমস্যাটির স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখকেরা। তবে স্বীকৃতি পর্যন্তই, বেশী মাথা ঘামান নি তা নিয়ে। বোধহয় লেখকদের মনের আসল ইচ্ছে ছিল এই বুদ্ধিমান প্রাণীকে ব্যাখার অতীত স্বয়ম্ভু কোন একটা কিছু বলা। অর্থাৎ এক কথায়, 'বিজ্ঞান'এর মধ্যে দিয়ে ভগবানে পৌছন। তবে সোজাসুজি ছাপার অক্ষরে বোধহয় তা লেখার ঝুঁকি নিতে চাননি হয়েল আর তাঁর সহকর্মী য়িক্রমসিংঘে।

['নিউ সায়েন্টিস্ট', খণ্ড 92, সংখ্যা 1275 (15 অক্টো, 1981)তে মার্ক রিডলী'র পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য]

পড়ানো হয় তবে আমার মনে হয় বাইব্‌ল এর সৃষ্টিবাদও এর সঙ্গে পড়ানো দরকার"। এই জন্যই ACLU এর উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে "সৃষ্টিবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, যাতে (আরকানসাস মামলার ফল) গোটা দেশে সবচাইতে বেশী প্রভাব ফেলতে পারে"। 1925 এর তুলনায় এই মামলার নতুনত্ব হল, এই মামলায় সৃষ্টিবাদের প্রবক্তরাই প্রতিবাদী পক্ষ। এতে তাদেরই দায় ছিল বিবর্তনবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন করা, অর্থাৎ দেখান যে সৃষ্টিবাদ ধর্মীয় কোন তত্ত্ব নয়, এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে!

আরকানসাসের লিট্‌ল রক-এ 1981'র 7 ই ডিসেম্বর শুরু হয় মামলার শুনানী।

সৃষ্টিবাদীদের বক্তব্য। বিবর্তনবাদই বা কি বলে।

সৃষ্টিবাদীদের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গির ও বক্তব্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। সৃষ্টিবাদীদের বিশ্বাস যে (1) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স কিছুতেই 6,000 থেকে 10,000 বছরের বেশী নয়, (2) জীবজগত মোটেই কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় আসেনি; প্রায় 10,000 বছর আগে সৃষ্টিকর্তা এক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছিলেন জীবকূল, এবং (3) বাইবলে বর্ণিত "নোয়ার বন্যা" একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা কিনা ঘটেছিলো সারা পৃথিবী জুড়ে।

হেনরী মোরিস, যিনি আমেরিকার সান ডিয়াগোর "সৃষ্টিবাদ সম্পর্কীয় গবেষণা সংস্থার" অধিকর্তা ও "Scientific Creationism" বইয়ের লেখক, মনে করেন যে সৃষ্টিবাদকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করা সম্ভব নয় কেন না সৃষ্টিকর্তা তো আর বিজ্ঞানীদের মর্জি অনুসারে সৃষ্টি করেননি। ঐ সংস্থারই সহ-অধিকর্তা ডুয়ানে গিস যিনি আবার "Evolution : the fossils say NO!" বইয়ের লেখক, একই রকম মতামত প্রকাশ করেছেন। সাউথ কেরোলিনার ওয়ফোর্ড কলেজের স্কট মরো বলেন যে বিবর্তনবাদ কতকগুলি অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন তথ্যের সমাহার ছাড়া কিছু নয়। সৃষ্টিবাদের ধারণা নাকি এর চেয়ে অনেক নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। তাহলে বিবর্তনবাদের কয়েকটি বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই পৃথিবী বা সৌরজগৎ তথা ব্রহ্মাণ্ডের বয়স নির্ণয় করা যায় নানাভাবে। যেমন, (ক) দূরবর্তী তারার রঙ এবং উজ্জলতা মেপে, (খ) ঐ ধরনের গ্রহ বা তারায় যে সমস্ত তেজস্ক্রিয় পরমাণু (যেমন পটাসিয়াম-40, আর্গন-40) আছে তাদের ক্ষয়ের হার মেপে, (গ) দূরবর্তী তারার আলো পৃথিবীতে পৌছতে কত সময় লাগছে তার হিসাব কষে, এবং (ঘ) ভূ-স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বয়স মেপে। এই রকম হিসাব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স 10 20 বিলিয়ন বছর এবং পৃথিবী তথা সৌরজগতের বয়স 4·5 বিলিয়ন বছর। জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যেতে পারে বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দিষ্ট প্রোটিনের এমিনো এসিড এককগুলির বিন্যাসের তুলনা করে। যেমন, সাইটোক্রোম-সি নামক প্রোটিনের এমিনো এসিডের বিন্যাস তুলনা করলে বোঝা যায় যে ব্যকটিরিয়া, উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের মধ্যে বিন্যাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে আবার কিছু অমিলও রয়েছে। কোটি কোটি বছরের বির্তনে এই অমিলগুলিই স্থায়ী রূপ নিয়ে জীবজগতে বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের রূপরেখা এইভাবে জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে।

বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের এই বক্তব্য ও প্রমাণগুলি কিন্তু সৃষ্টিবাদীদের মনে কোনই দাগ কাটতে পারে না। তাদের বক্তব্য বিবর্তন কোন প্রাশ্নাতীত বৈজ্ঞানিক বিবরণ বা ব্যাখ্যা নয়, একটি অনুমান মাত্র। এরা বলে, বিবর্তন ত' একবারই ঘটেছে, নতুন করে বিবর্তন ঘটানো ত' আর সম্ভব নয়। তাহলে তা একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই যে ঘটেছে সেটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা যাবে কি ভাবে? যে ঘটনা পুরোপুরি পরীক্ষাগারে ঘটানো সম্ভব নয় তার সম্পর্কেও যে বিভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তত্ত্বগঠন সম্ভব এ তারা স্বীকার করতে নারাজ তাদের আরো বক্তব্য যে বিবর্তনবাদকে কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষার সাহায্যে খারিজ করার কোন সম্ভাবনা বিবর্তনবাদীরা রাখে নি, তাই এটি কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হতে পারে না। ভাল কথা। কিন্তু একই নিরিখে ত' তাহ'লে সৃষ্টিবাদও গ্রহণযোগ্য তত্ত্বের স্বীকৃতি পেতে পারে না। তাছাড়া বিবর্তনবাদীরা তাদের তত্ত্ব খারিজ করার কোন পথ রাখে নি, এ কথাও ঠিক নয়। যেমন, বিবর্তনবাদ বলে 500 মিলিয়ন বছরের আগে স্তন্যপায়ী কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ 500 মিলিয়ন বছরের আগেকার জীবাশ্মের স্তরে কোন স্তন্যপায়ীর জীবাশ্ম পাওয় গেলে তা থেকে বিবর্তনবাদকে ভুল ব'লেই চিহ্নিত করতে হবে। এর বিপরীতে উল্লেখ করতে হয় সৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে ডুয়ানে গিস এর বক্তব্য: "আমরা জানি না সৃষ্টিকর্তা কি প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছিলেন সৃষ্টির সময়, কারণ সে প্রক্রিয়াগুলি এখন বস্তুজগতের কোথাওই সক্রিয় নেই। এই জন্যই সৃষ্টিকে আমরা বলি বিশেষ সৃষ্টি। আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে জানতেই পারব না সৃষ্টিকর্তার ব্যবহৃত সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে"।

এবারে আসা যাক লিট্‌ল রক-এর মামলায়।

লিট্‌ল রক-এর নয়টি দিন। 7ই ডিসেম্বর, 1981 বিচারপতি উইলিয়াম ওভারটনের অধীনে শুরু হয় মামলা।

সৃষ্টিবাদীদের সাক্ষী তালিকায় যে ষোল জন বিজ্ঞানীর নাম ছিলো তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাত জন এবং বির্বতনবাদীদের পক্ষে ছিলেন মাত্র চার জন।

সৃষ্টিবাদীদের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষ্য:

(1) হ্যারল্ড কফিন (ভূ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ক্যালিফোর্ণিয়া): ইনি নোয়ার বন্যার সপক্ষে কয়েকটি জীবাশ্মের ছবি দেখান। একটি

ছবিতে আছে হাঁ করা মাছের জীবাশ্ম এবং আরেকটিতে জীবাশ্মভূত মল। এতে নাকি প্রমাণ হয় যে বন্যার সময় বিরাট উথাল-পাথাল হয় এবং তাতে মাছটি চাপা পড়ে খাবি খেয়ে মারা যায়। প্রাণীর মলও অনুরূপ ভাবে চাপা পড়ে ও পরে সব কিছুই জীবাশ্মে পরিণত হয় (এটা অবশ্য তিনি ব'লতে পারেননি যে বন্যার জলের ধাক্কা সত্ত্বেও কি করে প্রাণীর মল ছড়িয়ে না পড়ে একই জায়গায় জমে থেকে নিশ্চিন্তে জীবাশ্ম হওয়ার সুযোগ পেলো)।

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনি যদি বাইব্‌ল না পড়তেন তাহ'লে কি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীর বয়স কোটি কোটি বৎসর?

উত্তর: হ্যাঁ। বাইব্‌ল না থাকলে করতাম।

(2) ডোনাল্ড চিটউইক (ওরেগনের ভৌত রসায়নবিদ, মিশিগানের ক্রিয়েশন রিসার্চ সোসাইটির সদস্য: ইনি বলেন যে পৃথিবী যদি কোটি কোটি বছরের পুরনো গ্রহ হয় তবে এতদিন যে পরিমাণ রেডিওএক্টিভ ক্ষয় হয়েছে এবং তাতে যে পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাস জমার কথা তা 'ত পৃথিবীর বায়ুস্তরে পাওয়া যায় না (হাল্কা হিলিয়াম গ্যাস বায়ুস্তর ছাড়িয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে সে সম্ভাবনা এঁর মাথায় কেন যে খেলেনি, বোঝা গেলো না)।

(3) ওয়েন ফ্রায়ার (প্রাণীবিজ্ঞানী, কিংস কলেজ, নিউ ইয়র্ক):

প্রশ্ন: আপনি ত' বিশ্বাস করেন যে বিবর্তনবাদ আর সৃষ্টিবাদের ভিতর যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া পুরোপুরি বিশ্বাসের ব্যাপার, নয় কি?

উত্তর: বিশ্বাসের ব্যাপার ত' রয়েইছে..... হ্যাঁ, মোদ্দা কথা তাই।

(4) চন্দ্রা বিক্রমসিংহে (সিংহলী গণিতজ্ঞ; এঁকে প্রতিবাদী পক্ষ ইংলণ্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ওয়েলস থেকে প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে আনিয়েছিল; ইনি বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে 'ইভলিউশন ফ্রম স্পেস' নামে দানিকেনীয় বইটির যৌথ রচনাকার): ইনি প্রথমেই সৃষ্টিবাদের সপক্ষে তিন ঘণ্টা ধ'রে লম্বা এক বক্তৃতা দেন। এঁর বক্তব্য, সৃষ্টিকর্তা আদিপ্রাণ রূপে কিছু জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মহাশূণ্যে, যেগুলি পরে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীতে এসে প্রাণের বীজ হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন: কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বিজ্ঞানী কি বিশ্বাস করতে পারেন যে পৃথিবীর ভূস্তরের বর্তমান গঠন কেবলমাত্র একটি বিরাট দুর্ঘটনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: কোন সুবিবেচক বিজ্ঞানী কি বিশ্বাস করতে পারেন যে পৃথিবীর বয়স দশ লক্ষ বছরের কম?

উত্তর: না।

এই ধরনের উত্তর অন্যান্য উপস্থিত সৃষ্টিবাদীদের নিরাশ ও বিরক্ত করে কেন না ভদ্রলোককে যাতায়াতের প্রচুর খরচ দিয়ে সাক্ষ্য দিতে আনা সত্ত্বেও এই উত্তরগুলি সৃষ্টিবাদীদেরই বিপরীতে যায়।

বিচারের রায় ও তারপর: বিচারপতি ওভারটন তাঁর দীর্ঘ 38 পৃষ্ঠার রায়ে সৃষ্টিবাদের বিপরীতে মত দেন ও বলেন যে আরকানসাস প্রাদেশিক সরকারের গৃহীত 'পক্ষপাতহীনতা'র আইনটি সংবিধান-সম্মত নয়। তিনি দেখান যে সৃষ্টিবাদী আন্দোলনের উৎস হ'ল গোঁড়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, এবং বিলটি পাশ করা হয়েছিল ধর্মীয় মতবাদ প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই। তেরো পাতা ব্যাপী একটি অংশে বিচারপতি ওভারটন দেখান যে সৃষ্টিবাদ আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হ'তে পারে না।

তবে তার মানে এই নয় যে সৃষ্টিবাদ সমূলে ধ্বংস হ'ল। বিচারপতি ওভারটনের রায় কেবল আরকানসাসেই প্রযোজ্য। সারা দেশে প্রযোজ্য হ'তে হ'লে এই রায় সুপ্রীম কোর্টে সমর্থিত হ'তে হবে। তার কোন সম্ভাবনা এখনই নেই। সৃষ্টিবাদীরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। ওভারটনের রায় বেরুনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসিসিপি প্রদেশের সেনেটে আরকানসাসের মতই একটি বিল গৃহীত হয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। একই সাথে সৃষ্টিবাদীরা চেষ্টা চালাচ্ছে লুইসিয়ানায় অনুরূপ একটি মামলা জিততে, কারণ লুসিয়ানায়ও মামলা দায়ের করেছে ACLU। আরো একাধিক প্রদেশে 'পক্ষপাতহীনতা'র বিলটির মত বিল পাশ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে সৃষ্টিবাদীরা আগের চাইতে আরো বেশী আটঘাট বেঁধে।

উনিশ শ' পঁচিশ..... উনিশ শ' একাশি.....। কে জানে লড়াইয়ের শেষ কোথায়।

পার্থপ্রতিম মজুমদার
টেক্সাস, আমেরিকা।

With best compliments from

Elecdrolik Engineering Co.

Aurobinda Road
Ramrajatala, Howrah-4.
Manufacturers of hydraulic equipments.

ভারতীয় বিজ্ঞান-ঐতিহ্য পঠনের রূপরেখা

দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাটের বিস্ময় উক্তিকে সামান্য পরিবর্তন করে যদি বলি 'কি বিচিত্র এই দেশের ইতিহাস', তবে অনুসঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয় একটি বিস্ময়কেও উচ্চারণ করতে হয়—'কি বিচিত্র এই দেশের ইতিহাস-বোধ!' ইতিহাস যদি অতীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর অখণ্ড ও ধারাবাহিক পারম্পর্যকে নির্দেশ করে, তবে ইতিহাসবোধ সেই ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে জনমানসের ধ্যানধারণা, যে ধ্যানধারণা বা আইডিয়া অতীত বা বর্তমান বাস্তবের যথার্থ প্রতিফলন নাও হতে পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধেও অনুরূপ ভাষ্য প্রযোজ্য, যেহেতু তা সমাজেতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

আত্ম-ইতিহাস বিস্মৃত ভারতবাসীর অপবাদ আজ হয়ত বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন বহু গবেষকের অমূল্য রত্ন-সদৃশ গবেষণার দৌলতে বহুলাংশে অপনয়িত। তবু অংকুরিত ধ্যানধারণার মরীচিকাকে শুধুমাত্র গবেষণালব্ধ সত্য পরাস্ত কয়তে অক্ষম। এদেশের প্রাচীন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তিকর জটপাকানো ঘোলাটে ধারণা নিয়ে পড়ুয়া বালক ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত 'শিক্ষিত' ভদ্রলোকে পরিণত হয় তা বড় মর্মান্তিক-পুঁথির জীর্ণ লালচে পৃষ্ঠায় পড়ুয়া পড়ে ক্লান্ত হয়- ভারতবর্ষের ইতিহাস আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস। আর বিজ্ঞান? সে সম্বন্ধেও পরস্পর-বিরোধী শতেক ধারণা ও মন্তব্যের জটা বিন্যাস অব্যর্থ ভাবে তাকে বিভ্রান্ত করে। তাই রেণেশাঁস-পরবর্তী আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নততম গবেষণালব্ধ ফলের প্রতি ভ্রূকুঞ্চন করে কেউ মন্তব্য করেন 'ওসবই ব্যাদে আছে'। কারও কাছে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত দর্শনচিন্তার কাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শন নিতান্তই স্থূল। আবার কোন অতিমার্জিত উন্নাসিক বলবেন—'ব্রিটিশাগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে আবার বিজ্ঞান-টিজ্ঞান ছিল না কি?' বামে হোক, মধ্যে হোক আর দক্ষিণেই হোক, এ সবই ধারণার অতিসরলীকরণের কিশোরসুলভ প্রবণতা। প্রথমোক্তদের কথাই ধরা যাক। তাঁদের আইডিয়াকে ভাষায় সম্প্রসারিত করতে গেলে বলতে হয় এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানসাধকদের চিন্তার কোনদিন সংঘর্ষ ঘটে নি, ঔপনিষদিক ব্রহ্মদর্শন আর সাংখ্যদর্শনের মধ্যে ছিল না কোন ভিত্তিগত বিরোধ, পুরোহিতের যাগযজ্ঞ-সর্বস্বতা আর মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসাবিদ্যারও কোন তাত্ত্বিক বা সামাজিক সংঘাতের অবকাশ ছিল না। মীমাংসা অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদের বিজ্ঞানবাদ ও রহস্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদের যে সময়-চিহ্নিত দ্বন্দ্ব প্রকাশিত, তাও ঢালাই হয়ে থাকে সেই এক ছাঁচে, আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যে। আধুনিক মননলব্ধ ইতিহাসবোধে অনীহা, বিজ্ঞানবোধে অন্ধতা আর শিশুপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থের চৌহদ্দিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখার ঐতিহ্যময়তা সব কিছুরই দোহাইমিলবে ঐ একটি সাফ্ কথার জয়ঢাকে—আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে। অথচ কালসাপেক্ষে সমাজ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাত, চিন্তার ঐক্য-অনৈক্য ও জীবনের অযুত বৈচিত্র্য-ময়তার সমন্বয়ে গঠিত। এক লেবেলে এই আলো-আঁধারি ইতিহাসের অনুধাবন করতে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। বরং যথার্থ সত্যানুসন্ধানে আগ্রহী পাঠককে ভারতীয় বিজ্ঞানের উৎস, তার আধুনিক-মনস্কতা, স্ববিরোধ, এবং সর্বোপরি তার অকাল-অন্তর্জলীর উৎস অনুসন্ধান করতে হবে সমাজেতিহাসের সঙ্গে যথার্থ সম্পৃক্ততায়। তা নইলে শুধু বিজ্ঞানের মধ্যেই বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের প্রণিধান করতে যাওয়া জলাশয়ে ডুবে জলের রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের মতই অলীক পরিগণিত হতে বাধ্য। গবেষকের নয়, একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই মৌলিক প্রশ্নগুলোকে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করবো।

বিজ্ঞানী বার্নাল অন্যান্য মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা ধর্ম, আইন, দর্শন শিল্পকলা প্রভৃতির তুলনায় বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্যজনক পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্য হল তার ক্রমসঞ্চিত ঐতিহ্য[1]। রেণেশাঁস-উত্তর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই ক্রমসঞ্চিত ঐতিহ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। প্রাচ্য বিজ্ঞান বা গ্রীক বিজ্ঞান সেই ঐতিহ্যের যথার্থ সুযোগ পায় নি, যেহেতু যৌক্তিক বিজ্ঞানের গোড়া-পত্তন করতে হয়েছিল তাদেরই। তাই প্রাচ্য বিজ্ঞানের আলোচনা বা প্রণিধানের দৃষ্টিভঙ্গী উত্তর-রেণেশাঁস পাশ্চত্য বিজ্ঞানের বিবর্তনের তুলনায় অবশ্যই ভিন্নতর হবে। এই প্রসঙ্গে পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি প্রশ্নকে তাৎপর্য সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, প্রাক্ আর্য যুগ থেকে মুসলিম আক্রমণে প্রাক্কাল পর্যন্ত অন্তত চার হাজার বছরের যথার্থ সময়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ। বহুক্ষেত্রেই আলস্যবশতঃ আমরা এই সময়ের ক্রমিক বিভাগের যথার্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে এই সম্পূর্ণ সময়সীমাকেই 'প্রাচীনকাল' নামক এক দুরতিক্রম্য আঁধার অতীতে ঠেলে দিই।

দ্বিতীয়তঃ এই সুদীর্ঘ সমাজ প্রগতিধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ব্যবহারিক জীবনধারার মধ্যে কাকে যথার্থ বিজ্ঞানের সন্ধান দেব সে

সম্বন্ধে মানসিক বোঝাপড়া। তৃতীয়ত, সমাজের অর্থনৈতিক, উৎপাদনব্যবস্থাভিত্তিক ও চেতনাভিত্তিক বিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের সম্পর্ক নির্ণয়। চতুর্থত, এই তিন বিশদ পাঠের সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় তথা প্রাচ্য বিজ্ঞানের অন্তর্জলীর কারণ অনুসন্ধান।

যোসেফ্ নীড্হ্যাম প্রমুখ বিদগ্ধজন সভ্যতার আদিতে ম্যাজিক ও বিজ্ঞানের যে অভিন্নতাকে বিশ্লেষণ করেছেন তা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক সত্য। বিজ্ঞানের সেই উষাকালে ম্যাজিক ও বিজ্ঞানের একসূত্র বাঁধা ছিল সংঘবদ্ধ শ্রম জনিত কৌম (tribal) ব্যবস্থায়। বিজ্ঞানের বিবর্তনের এই ধারা অনুসরণ করেই বার্নাল বিজ্ঞানের অন্য নাম দেন **rational mythology**. ম্যাজিকের ভিত্তি মানুষের বিভ্রম। কিন্তু কাল সাপেক্ষে তার উপযোগিতাকে শুধু বিভ্রম বললে অতীত বীক্ষণেই বিভ্রম ঘটবে, কারণ ম্যাজিক সংঘবদ্ধ শ্রমের একটি মানসিক প্রেরণা। কৃষির আদি যুগে এই মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতীয় তন্ত্রসাধনার ভিত্তি নিহিত ছিল কৃষিজনিত সংঘবদ্ধ দৈহিক শ্রমে। পরবর্তীকালে অবশ্য তন্ত্রসাধনা ব্যবহারিক সমাজজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে অবিমিশ্র বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। ইতিহাস গবেষকদের ধারণায় পরবর্তী ভারতীয় বিজ্ঞানের অংকুর—বিশেষত শারীরবিদ্যা ও অ্যালকেমির ক্ষেত্রে এই তন্ত্রসাধনাতেই নিহিত ছিল।[2] প্রাক্ আর্য যুগ থেকে এর ব্যপ্তি আর্যসভ্যতার সমান্তরাল ভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় 'একদিকে অ্যালকিমীয় পদ্ধতি আর অন্যদিকে বীভৎস, অশ্লীল, ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যক্কারজনক, সব আচারের এক অদ্ভুত মিশ্রণ হ'ল তন্ত্র'[3]। তবু সেই ম্যাজিক বিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হতে পারল না। সেই একই কথা প্রযোজ্য প্রাচীন বৈদিক গাথা থেকে উপনিষদিক চিন্তায় উত্তরণেও। ঋক্বেদে উল্লিখিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাগযজ্ঞ আদিতে যে পার্থিব সমৃদ্ধি ও ভোগ্য অর্থনীতির (**consumption economy**) উন্নতির জন্য মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপক স্বরূপ ছিল সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। বস্তুত, মধ্যযুগীয় গ্রীস ও রোমের অনুসরণে যে সর্বব্যাপী ক্রীতদাস প্রথা ভারতীয় উৎপাদনসম্পর্কে স্থান নিতে পারে নি তার কারণ তরবারি ও তীরধনুকের প্রয়োজনীয়তাকে যথাসম্ভব হ্রাস করেছিল ধর্মীয় অনুশাসন। এ প্রসঙ্গে কোসম্বীর বক্তব্য, 'ভারতীয় পদ্ধতিতে ধর্ম, জাতিভেদ ও 'স্মৃতি'গুলির সহায়তায় বলপ্রয়োগের প্রয়োজন পৌঁছেছিল ন্যূনতম মাত্রায়, বিধিনিষেধগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল তরোয়াল অথবা তীর-ধনুকের চাইতে বেশী কার্যকর ভাবে। ফলে প্রয়োজন হয়নি বড় পরিসরে দাসপ্রথার, যা গ্রীস আর রোমে ছিল, অথচ ভারতীয় উৎপাদন-সম্পর্কে কোনদিনই বিশেষ গুরুত্ব পায় নি[4]। এসবই প্রথম আর্যযুগ ($1500—1000$ খৃঃ পূর্বাব্দ) সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তবে ব্রাহ্মণরা প্রকৃতই কৃষিতে আগ্রহী ছিল অথবা প্রাক্ আর্যযুগে অনার্যদের কারও মধ্যে কৃষির প্রচলন ছিল না, এই মত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করেন না। বিশেষত রামায়ণের আধুনিক ব্যাখ্যায় যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীবিরোধের পরিচয় পাই, তাতে ব্রাহ্মণদের গোপালন ছাড়া উন্নততর অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কতটা আগ্রহ ছিল তা সন্দেহযোগ্য[5]। যাই হোক, কালক্রমে এই সংস্কারসর্বস্বতার দরুন ব্রাহ্মণ্য-ক্রিয়াকলাপ প্রতিক্রিয়া ও অবিজ্ঞানের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বহু দেবতার অর্থহীন ধাঁধাঁকে অতিক্রম করে ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদ বা পরম-ব্রহ্মের কল্পনা উন্নততর তাত্ত্বিক লজিকের স্বাক্ষর রাখলেও দৈহিক শ্রমের সঙ্গে ম্যাজিকের অনন্বয় (**alienation**)-কে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হল। পরবর্তে আনল বস্তুসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্যুত এক ভাববাদী দর্শন। এর অমেয় প্রভাব বিজ্ঞানও এড়াতে পারে নি। 'কৃচ্ছ্রসাধন আর পরলোকমুখী প্রবণতাগুলি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল জাগতিক অগ্রগতির আকাঙ্খার উপর'।[6] উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার জন্য সাংখ্য বা মীমাংসা দর্শনের নিরীশ্বর চিন্তাও বিজ্ঞানকে যোগাতে পারে নি প্রগতির রসদ[7]।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বৈদিক যুগে গণিত ও জ্যোতিষের অত্যন্ত লক্ষণীয় মৌলিক চর্চা হয়েছিল। অবশ্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রেরণা যতখানি যাগযজ্ঞের সময়কাল নিরূপণের সূত্রে, অথবা জ্যামিতি বা রেখাগণিতের বিকাশ যতখানি যজ্ঞবেদীর পরিমাপ সম্পর্কিত কল্পসূত্রের অধ্যয়নে তার এক শতাংশও শ্রম ও উৎপাদনের সূত্রে বিকশিত হয় নি। জ্যোতিষ ও গণিতের বিস্ময়কর বিকাশ পরবর্তীকালে কেন স্তিমিত হয়ে গেল তার উৎস সম্ভবতঃ এখানেই। মুখ্যত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত শ্রেণীর হাতে গণিত ও জ্যোতিষচর্চা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ঐ সমস্ত বিদ্যার শ্রেণীচরিত্র একদিকে বিজ্ঞানের বিকাশের ও বিপরীতে বিকাশের অন্তরায়ের কারণ হয়েছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যথার্থ চিন্তায় আধুনিক অর্থে ধর্ম ও শ্রেণী নিরপেক্ষ, মানবতাবাদী এবং যুক্তিমূলক বিজ্ঞানচর্চার যথার্থ সংহতি ও বিকাশ ঘটেছিল শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ চর্চায়[8]। (ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরের যে মনোজ্ঞ দার্শনিক ব্যাখ্যা চার্লস সিংগার বা ক্রিস্টোফার কড্ওয়েলের লেখায় পাই, তার যথাযথ প্রতিফলন এই চিকিৎসাবিজ্ঞানেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিক বিকাশ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা দর্শনচর্চার সঙ্গে সংঘাত ছাড়াই ঘটেছিল এমন কিশোরসুলভ ধারণা বর্তমান সমাজ-গবেষকরা পোষণ করেন না। প্রাচীনানুরাগের নস্টালজিয়ায় অন্ধ না হয়ে যুক্তিমনস্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করলে দেখব যজুর্বেদ থেকে মনুসংহিতা পর্যন্ত ব্যাপ্তিতে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যা শাস্ত্রকারের দ্বারা শ্রান্তিহীনভাবে নিন্দিত হয়েছে। ঋগ্বেদের যে অশ্বিনীদ্বয় ভেষজ দেবতা রূপে আরাধ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যযুগের চরম প্রতি-ক্রিয়ার কালে সেই দেবতাদেরও 'সেন্সার' করা হয়েছিল তাঁদের বিজ্ঞান

মনস্কতার জন্য, মানুষতো দূরের কথা। চতুর্বেদের অন্যতম হওয়া সত্বেও অথর্ববেদের সামাজিক সম্মান হ্রাস পেয়েছিল। সুবৃহৎ উপনিষদেও পাওয়া যাবে না কোন দেব বা মনুষ্য চিকিৎসকের উল্লেখ। এক দিকে ধর্ম ও শ্রেণী নিরপেক্ষ চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং পুরোহিততন্ত্রের মৌলিক বিরোধ এবং অপরদিকে শ্রম-অনন্বিত জ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানের প্রসারে আনল আকাশস্পর্শী বাধা। শ্রমবিভাজনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিন্যাস কালক্রমে আবাহন করল মস্তিষ্ক-শ্রম ও দৈহিক-শ্রমের অনন্বয়কে। ব্লেকের কবিতার একটি পংক্তি স্মরণযোগ্য—"Great things are done when men and mountains meet"। না, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে মানুষ ও পর্বত মিলতে পারে নি। বহু মানুষকে সামাজিক দাসত্বে ও অবহেলায় রেখে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বৈজ্ঞানিক টেক্‌নিক বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন যে প্রায় হয়ই না তার প্রমাণ ইতিহাসে অল্প নয়। প্রাচীন কাল থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন অবধি হাজার বছর ধরে ক্রীতদাসশ্রেণী খনির কাজ করে এসেছে, কিন্তু দাসজীবনের মৃত্যুসম উদ্যমহীনতা ও ভারাক্রান্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার দরুন এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্বেও খনির উৎপাদনের কাজে এতটুকু যান্ত্রিক উন্নতিসাধন তারা করতে পারে নি [9]।

গ্রেকো-রোমান বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তিকালে ইউরোপে যখন তমাসাচ্ছন্ন যুগ চলছে, প্রাচ্য বিজ্ঞান তখন লাভ করে ছিল গ্রীক বিজ্ঞানের যোগ্য উত্তরাধিকার। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ তখন আর্যভট্ট বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিজ্ঞানের শিরোভাগে সমুজ্জ্বল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এতবড় বিজ্ঞানকেও আত্মসাৎ করল 'মিথ্'। অর্থাৎ ম্যাজিক থেকে rationalised mythology হিসাবে বিজ্ঞানের রূপান্তরের পরিবর্তে ইতিহাস বিজ্ঞান চেতনা থেকে মিথ-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করল। যে বরাহমিহির সমুচ্চকণ্ঠে সূর্যগ্রহণের রাহুগ্রাসজনিত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে বৈজ্ঞানিক মনন অনুসৃত ব্যাখ্যা দিলেন, সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণার জগতে তিনি নিজেই ইতিহাসের বদলে মিথ্ হয়ে গেলেন। মানুষ মনে রাখল না জোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহিরকে। পক্ষান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক নামকে বিশ্লিষ্ট করে উদ্ভব হল অনৈতিহাসিক চরিত্র সমূহ - বরাহ নামে এক গনৎকার ও তাঁর পুত্র মিহির; পুত্রবধূ খনা—যার জিহ্বা কর্তন ও সে সম্পর্কিত টিকটিকির গল্পই প্রাধান্য পেল। ভাষাবিশারদদের মতে খনার বচনের সময়কাল আজ থেকে চারশো বৎসরের পূর্বে নয় [10], অথচ বরাহমিহিরের জীবনকাল ষষ্ঠ শতক। ভাস্করাচার্যকে অতিক্রম করে জনমানসে স্থান পেলেন সুন্দরী লীলাবতী, যিনি ভাস্করাচার্যের মানসলোকের সঙ্গিনী, বাস্তব সত্তা নন—যাকে ভাস্কর তাঁর গণিতিক উপাদ্যসমূহ উদ্দিষ্ট করেছিলেন। সচেতন পাঠকের প্রয়োজন এই বিজ্ঞানগ্রাসী 'মিথ্'এর সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অনুধাবন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বিশেষত মুসলিম বিজয় পরবর্তী তাণ্ডবলীলা ভারতবর্ষের মন্দির বা ধর্মপীঠস্থানকেই শুধু ধ্বংস করেনি, বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি সমৃদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেও ধূলিসাৎ করেছিল। মনস্বী আলবেরুণী ভারত পরিক্রমা শেষে বিষন্ন চিত্তে স্মরণ করেন 'মামুদ দেশটির সমৃদ্ধি চূড়ান্ত ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে আর এমন সব বিস্ময়কর কাজ করেছে যার ফলে হিন্দুরা ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। .....এই কারণেই আমরা দেশটির যে সব অংশ জয় করেছি সেখান থেকে হিন্দু বিজ্ঞান অন্তর্হিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে এমন সব জায়গায় যেখানে আমাদের হাত এখনো পৌছয় নি'[11]।

তৎকালীন প্রখ্যাত আরব চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী শেখ আলি শিয়া এরই প্রতিবাদস্বরূপ প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন [12]। তবু বাইরের এই আঘাতের চেয়েও বহুগুণে কার্যকরী ছিল আপন অন্তরের ক্ষয় রোগ। মুসলিম বিজয় অভিযান সহজে ফলপ্রসূ হবার অন্যতম কারণ ব্রহ্মণ্যতন্ত্র ও তার ধ্বজাধারী রাজশক্তির হাতে পতিত ও বৌদ্ধদের নিগ্রহের কারণে জাতীয় সংহতির বিনাশ। কাজেই অন্য কথায় মুসলমান আক্রমণ ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ারই অন্যতম ফল বললে ভুল হবে না। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সন্দেহ প্রকাশ করেন—(পারস্যে) "জনসাধারণ পুরোহিত তন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকায় সৈন্যদল ও জনসাধারণের অনেকে মুসলমান সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরবদের সঙ্গে যোগদান করে। ...ভারতেও এই প্রকারের ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। ডবলিউ আর্নল্ড-এর 'প্রিচিং অফ্ ইসলাম' নামক পুস্তকে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার পাঠ করলে অবশ্য উপরোক্ত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়"[12]। বৌদ্ধ নিগ্রহের ফল বর্ণনা করে ভূপেন্দ্রনাথ বলেন যে এই সামাজিক নির্যাতনের "ফল হিসাবেই তারা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও ব্রহ্মণ্যবাদীগণের প্রতি বিমুখ হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে মুসলমান আক্রমণের সময় নিশ্চেষ্ট ছিল"।

ভারতীয় বিজ্ঞানের যবনিকাপাতের প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের উল্লেখ করে আজকের আলোচনা শেষ করব। যদিও এশীয় উৎপাদনব্যবস্থা বলতে মার্কিস যে স্থবির উৎপাদনব্যবস্থার কথা বুঝেছিলেন আধুনিক বহু মার্কসবাদী গবেষক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তবু এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই যে ইউরোপীয় ধারার অনুরূপে এদেশে প্রাক্ ব্রিটিশকালে সামন্ততন্ত্রের গর্ভে পুঁজিতন্ত্রের জন্ম হয়নি। মধ্যযুগে ভারতীয় বিজ্ঞানের সূর্যাস্তের সমান্তরাল প্রশ্ন, কেন সনাতন উৎপাদনপদ্ধতির ভারী শিল্পমুখী পরিবর্তন হল না। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের মাধ্যবর্তী স্তরে হয় বণিক পুঁজির (mercantite capital) সৃষ্টি, যা হল পুঁজির আদি সঞ্চয়। সেই বণিক পুঁজি তো ভারতবর্ষে প্রভূত পরিমাণেই সঞ্চিত হয়েছিল, যার সাক্ষ্য দেয় মধ্যযুগীয় কাব্যে সাহিত্যে সওদাগরদের

দেশান্তরী বাণিজ্যের বর্ণাঢ্য কাহিনী। কেন এই সওদাগরেরা বুর্জোয়া শ্রেণীতে রূপান্তরিত না হয়ে বিলুপ্ত হল, নতুবা নেমে এল দালাল বা দোকানদারের স্তরে? ধনপতি সওদাগরের উত্তরসূরী হিসাবে আমরা পেলাম জগৎশেঠ, রায়দুর্লভের মত অভিজাত পায়রা-ওড়ানো বিলাসী মুৎসুদ্দিদের। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ এই আলোচনার সূত্রপাতে তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন (1) সঞ্চয়ের প্রবণতা, (2 স্বল্প সুদের হার, (3) বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও ভৌগলিক পরিবর্তন[15]। এসব সত্ত্বেও যথার্থ সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলি আজও বিভ্রান্তির অন্ধকারে। প্রাক্-বৃটিশ যুগে ভারতীয় শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণী বিকশিত হয়নি, একথার পাশাপাশি বলতে হয় যে নতুন টেকনোলজির বিকাশের লক্ষণ যে না ছিল তাও নয়। আবার মুঘল ভারতের সামাজিক কাঠামো যে টেকনোলজির বিকাশে খড়্গহস্ত ছিল এমন সিদ্ধান্তও ধোপে টেকে না। ইরফান হাবিবের বক্তব্য,'কারিগরী অগ্রগতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটির ভিতর অন্তর্নিহিত কোন প্রতিরোধ ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন উদ্যানবিজ্ঞানে ও সমরবিদ্যায় এই ধরণের অগ্রগতিকে মোগল রাজদরবার ও শাসক শ্রেণী -গুলি উৎসাহ যুগিয়েছিল। অন্য কিছুক্ষেত্রে, যেমন জাহাজ তৈরীতে, প্রতিযোগিতার চাপে বেশ কিছুটা কারিগরী প্রয়োগ ঘটেছিল, যার পিছনে ব্যবসায়ীদের চাহিদার সম্ভবত প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। এছাড়া আর কিছু ক্ষেত্রে—সম্ভবত সব চাইতে বেশী পরিসরে—উৎপাদক ও কারিগরেরাই প্রত্যক্ষ আর্থিক সুবিধার আশায় কারিগরী উদ্ভাবন গ্রহণ করেছিল'[16]। হাবিবের এই বর্ণনায় মনে হতে পারে দেশজ শিল্প ও বিজ্ঞান বিকাশের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। বৃটিশ আগমনেই কি তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল? ইতিহাসের কার্যকারণ চিন্তায় বৃটিশ না এলে কি হত সে ভাবনা মূল্যহীন। কোন ভারসাম্যের অভাবে অঙ্কুর পরিণত হল না তার বিশ্লেষণই প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার অবকাশ আলোচ্য প্রবন্ধে নেই, তবু একথা অবশ্য স্মর্তব্য যে ভারতীয় বিজ্ঞানের অকালমৃত্যুর প্রশ্নটির বিভ্রান্তি সর্বাংশে ঘুচবে না যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহু মূল্যবান সম্পদ দিয়ে বিশ্বজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তার পাশাপাশি সামাজিক ধর্মীয় অমানবিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবও কম নয়। এই প্রতিক্রিয়া প্রাচীন বিজ্ঞানকে বিকশিত হতে যতখানি বাধা দিয়েছে, তার চেয়েও বেশী সাহায্য করেছে দেশবাসীকে নিজের বিজ্ঞান-ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসবোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে, বিজ্ঞানবাদ ও রহস্যবাদকে একীভূত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। পরিতাপের বিষয়, এই অধুনিক কালেও চরক সুশ্রুত জীবকের বিজ্ঞান চিন্তা দূরে থাক, সময়ের অনুপাতে বিচার করলে আমরা কৃষিভিত্তিক তন্ত্রসাধনা বা পার্থিব সমৃদ্ধিভিত্তিক ঋক্‌বেদের প্রকৃতি দেবতার সাধনা থেকেও চিন্তায় পশ্চাৎপদ ও অবৈজ্ঞানিক ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মানবিক ঐতিহ্যের সজীবতাকে উপেক্ষা করে আমাদের মৃত অংশেই আগ্রহ যেন বেশী। ভাঙ্গাগড়ার এই অস্থির সময়ে আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রকৃত ঐতিহ্যকে জনমানসে পুনর্গঠনের সময় বোধ হয় এসেছে।

সত্যজ্ঞান রায়

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্র নির্দেশ

1. জে, ডি বার্নাল: Science in History, Watts & Co, পৃ. 18–19
2. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: LOKAYATA, People's Publishing House পৃ. xxii
3. পি. সি. রায়: History of Hindu Chemistry (I), London, Introduction xxxv.
4. ডি. ডি. কোসম্বী: The basis of ancient Indian History [জাতীয় গ্রন্থাগার সংকলিত Early Stages of Caste System in Northern India & other essays এর অন্যতম প্রবন্ধ]
5. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
6. বিকাশ মিশ্র: Hinduism & Economic Growth, Oxford Univ. Press; 1962–[The Vedic Phase শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য]
7. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: Indian Atheism, People's Publishing House, পৃ: 311।
8. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: Science and Society in Ancient India, Research India Pub.—চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
9. সমরেন্দ্রনাথ সেন: বিজ্ঞানের ইতিহাস (1), কলিকাতা, পৃ. 319
10. ভারতকোষ (3য় খণ্ড): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—"খনা" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।
11. আলবেরুণী: Alberuni's India (Tr. & Ed. Sachan) - New York.
12. অরুণ কুমার বিশ্বাস: Science in India, Firma K. L. M., Cal, (1969,—পৃ. 21—22
13. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: বাঙ্গলার ইতিহাস, নবভারত পাবলিশার্স পৃ. 52
14. ঐ পৃ. 54
15. বিনয় ঘোষ: 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' সংকলনে 'বাংলার সওদাগর শ্রেণী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
16. ইরফান হাবিব: The Technology and economy of Mughal India [Indian Economic and Social History Review, Jan-March, 1980. p. 1-31]।

ওষুধের কথা

গত 7 এবং 8ই নভেম্বর দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ 'ভেষজ শিল্প এবং ভারতীয় জনগণ' এই বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। সেমিনারটির উদ্যোক্তা ছিল ছটি সংস্থা— দিল্লী সায়েন্স ফোরাম, ফোরাম ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যাণ্ড সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশান অফ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কাস অফ ইণ্ডিয়া, সোসাইটি অফ ইয়ং সায়েন্টিস্টস, অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন্স এবং ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভস অ্যাসোসিয়েশনস অফ ইণ্ডিয়া। সেমিনারের মূল সভাপতি শ্রী পি· এন· হাকসার উদ্বোধনী ভাষণে জানালেন যে এই সেমিনারটির জন্য D.S.T.-র কাছ থেকে কার্যবিবরণী ছাপার বাবদে কিছু অনুদান ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে অর্থ সাহায্য আসে নি, উদ্যোক্তাদের তা প্রত্যাশিতও ছিল না। সেমিনারের অর্থ এসেছে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে। সম্মেলনের আহ্বায়িকা ডঃ ইমরানা কাদির জানালেন, প্রথাগত অন্যান্য সেমিনারের মত বক্তৃতা, আলোচনা এবং প্রস্তাব গ্রহণেই এই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটবে না, এই সেমিনার প্রকৃত পক্ষে এক দীর্ঘ আন্দোলনের সূচনামাত্র।

সেমিনারে 26টি পেপার পঠিত ও আলোচিত হয়। এসবের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, আমাদের দেশের ওষুধের বাজারে কতিপয় বিদেশী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র প্রাধান্য এবং তজ্জনিত অর্থ নৈতিক শোষণ এবং দেশে পর্যাপ্ত কারিগরী দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ভেষজশিল্পে অদ্যাবধি স্বনির্ভরতা না আসার কারণগুলির বিচার-বিশ্লেষণ। সম্মেলনে বিস্তৃত আলোচনা হয় যে যদিও অধিকাংশ রোগের প্রতিকারে মাত্র কিছু সংখ্যক মৌল ওষুধেরই [basic drug] প্রয়োজন হয় (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে 200টি, হাতি কমিটির[1] সুপারিশ মতে 117টী এবং অনেক ভারতীয় বিশেষজ্ঞের মতে কিঞ্চিদধিক 50টী মৌল ওষুধেই ভারতের প্রধান প্রধান মারণ ব্যাধিগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব), বাজারে কিন্তু মৌল ও ফর্মুলেশন (formulation) মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ওষুধ চালু আছে। এর অর্থ, বাজার-চলতি অধিকাংশ ওষুধই অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। বিদেশী ওষুধ সংস্থাগুলি মৌল ওষুধ উৎপাদন কম করে বা আদপেই না করে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ফর্মুলেশন ওষুধ উৎপাদন করে, যাতে আর্থিক ও কারিগরী বিনিয়োগ স্বল্পতর পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু মুনাফা আসে অধিকতর পরিমাণে। এর ফলে টি· বি· রোগী জীবনদায়ী স্ট্রেপটোমাইসিন যোগাড় করতে হিমসিম খান, কিন্তু ফার্মেসীর তাকে তাকে সাজান দেখা যায় সুরম্য আধানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের বিভিন্ন 'টনিক'। এতেই ক্ষান্তি নেই। বিদেশে অপ্রচলিত বা বিপজ্জনক বিবেচনায় নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত ওষুধের অস্মিন দেশে প্রস্তুতি ও বিক্রয়ও এই সব বিদেশী সংস্থা ভালোমাপেই করছে, এবং তদুপরি এরা নিজেদের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত বা সংশ্লেষিত নতুন ওষুধ পরীক্ষা করতেও এদেশীয় তথাকথিত কিছু 'গবেষকের' সহায়তায় এদেশের মানুষকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করছে, সভায় তারও বিস্তৃত আলোচনা হয়। স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছরেও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ভেষজশিল্প এ যাবৎ মাত্র 5 শতাংশ লোককে উপকৃত এবং 20 শতাংশ লোককে প্রান্তিকভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে, এ করুণ চিত্রও আলোচনায় ফুটে ওঠে। আলোচিত হয় যে, যে বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি যুগ যুগ ধরে সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, উপযুক্ত পরীক্ষান্তে সেগুলির গ্রহণীয় অংশসমূহও জনকল্যাণে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। স্বনির্ভরতার প্রশ্নে পাবলিক সেকটারের অন্তর্গত ওষুধসংস্থা গুলির বর্তমান কর্মধারাও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

দু-দিনব্যাপী প্রবন্ধপাঠ ও বিস্তৃত আলোচনার শেষে সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

* স্বাস্থ্য জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার অর্জন একটি সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্য-প্রকল্প, যার থেকে উদ্ভূত হবে একটি যুক্তিনির্ভর ভেষজনীতি, ভিন্ন সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হল যে দেশে রোগ-প্রাদুর্ভাবের ধরন (pattern) এবং ভেষজ প্রস্তুতি ও সরবরাহ সুসমঞ্জস নয়। ভেষজ-উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মুনাফা।

* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে ভেষজশিল্প অদ্যাবধি বহুজাতিক সংস্থা সমূহেরই কুক্ষিগত। বর্তমানে প্রচলিত নীতি-নির্ধারক বিভিন্ন উপায়গুলি এ অবস্থার প্রতিবিধানে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে দেখেছি যে একদিকে যেমন বহু অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন অব্যাহত আছে, অপরদিকে প্রতিষেধক নিরাময়কারী ও জীবনদায়ী অত্যাবশ্যক ওষুধসমূহের উৎপাদন ও সরবরাহ ক্রমাগত উপেক্ষা করা হচ্ছে।

* আমরা সুপারিশ করছি যে ওষুধের বাজারী নামের (brand name) পরিবর্তে তাদের রাসায়নিক নামের (generic name) প্রবর্তন করা হোক।

* আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, যে সব ওষুধ ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই সরাসরি বিক্রয় হয় (over the counter drugs), তাদের কার্যকরিতা সম্পর্কিত অধিকাংশ দাবীই বিজ্ঞানগত বিশ্লেষণে ধোপে টেকে না। ওষুধের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উন্নয়নের (sales promotion) ওপর যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক।

* ভেষজ শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) বাবদ ব্যয় সমস্যা-সমূহের ব্যাপকতার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারিগরী জ্ঞান আমদানীর বর্তমান নীতিও ভেষজশিল্পে স্বনির্ভরতার পক্ষে সহায়ক নয়। একটি কারিগরী নীতি সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রণয়ন করা আশু প্রয়োজন, যার দ্বারা কারিগরীর পৌনপুঃনিক আমদানী বন্ধ হয় এবং অনুভূমিক প্রসার (horizontal transfer) উৎসাহ পায়। কারিগরীর যথাযথ বিশ্লেষণ, আত্তীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য কারিগরীর আমদানীর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসংগিক গবেষণা ও কারিগরীর কোন প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে হবে।

* আমাদের দেশের জনগণের অধিকাংশই তাদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আজও প্রধানত চিরায়ত (traditional) চিকিৎসাব্যবস্থাগুলির ওপরই নির্ভর করে থাকে। এসব চিরায়ত পদ্ধতির ভেষজ সমূহের বিজ্ঞান-সম্মত উন্নয়নের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

* দেশে যে সব ওষুধ পরীক্ষা হয় তার জন্য ভেষজ নিয়ামকের নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে মেনে চলার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে জানিত সম্মতি (informed consent) নেওয়ার প্রয়োজনিয়তার ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি। এসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করতে হবে। 1974-76 সালে কলকাতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অভ মেডিক্যাল রিসার্চ কর্তৃক সংঘটিত ওষুধ ও কলেরা ভ্যাকসিন পরীক্ষায়[2] নীতিনিয়ম লঙ্ঘনের একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া আবশ্যক বলে এই সেমিনার মনে করে।

* হাতি কমিটির সিদ্ধান্ত, যাতে দেশে ভেষজ শিল্পে নীতিসমূহের পরিকল্পনা, প্রবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করার জন্য একটি জাতীয় ভেষজ কর্তৃপক্ষ (National drug Authority) গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যথাশিঘ্র প্রবর্তনের সুপারিশ আমরা করছি।

* সবশেষে, আমরা ভেষজশিল্পে বিরাজমান বহুজাতিক সংস্থাগুলি জাতীয়করণ করার সুপারিস করছি। একই সঙ্গে আমরা সুপারিশ করছি যে ভেষজশিল্পের পাবলিক সেক্টর কোম্পানীগুলির কর্মধারার উন্নয়ন করে তাদের প্রকৃত অর্থে গণমুখী ও জাতীয় করে তুলতে হবে।

সম্মেলন পরিসমাপ্তির পর উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহনকারী সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি আলোচনাচক্রে মিলিত হন এবং প্রত্যেক সংগঠন থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি মনিটারিং কমিটি গঠন করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে এই কমিটির মূল কেন্দ্র হবে দিল্লী সায়েন্স ফোরামের সদর-দপ্তর (55 Saket, New delhi 110017)। স্থিরীকৃত হয় যে এই কমিটি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির রূপায়নে সচেষ্ট থাকবে, এতদ্বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং তা মূল কেন্দ্রে পাঠাবে, যেখান থেকে সেইসব তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হবে। ইংরেজিতে প্রকাশিত এইসব তথ্যাবলি অতঃপর বিভিন্ন সদস্য সংগঠন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে। মনিটারিং কমিটি প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং পদ্ধতিগত দিক অলোচনার মাধ্যমে স্থির করবে।

প্রতিবেদকের মন্তব্য। চারিত্রিক বিশ্লেষণে দিল্লীর এই সম্মেলনটি সত্যই এতদ্বিষয়ক অপরাপর সম্মেলনের থেকে আলাদা ছিল। রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ভেষজ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, পবলিক সেক্টরের প্রতিনিধি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা ও অবস্থানের লোকেরা এখানে মিলিত হয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আলচনায় অংশগ্রহণ করেন। যদিও উদ্যোক্তারা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছেন, বহুজাতিক সংস্থার কাছে দাসখত দেওয়া সরকারী নীতি ও প্রশাসন যন্ত্রকে জাতীয় স্বার্থের দিকেমোড় ফেরানর বিশেষতঃ I M F ঋনের পরেও, এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের বহুদূর যেতে হবে এবং আন্দোলনের এই নবজাত অঙ্কুরটিকে ব্যাপ্ত করতে হবে দেশের প্রান্তে উপান্তে শিক্ষিত অশিক্ষিত জনতার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে লক্ষনীয়, ভেষজ শিল্পে (কোন শিল্পে নয় !) দেশী বিদেশী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি যত্নবান বর্তমান সরকারের নীতি পুনরায় ঘোষিত হয়েছে 24 নভেম্বর লোকসভায় পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রী শ্রী পি-সি. শেঠীর একটি জবাবী ভাষণে, যাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন বহুজাতিক ওষুধসংস্থাগুলির অধিগ্রহণের অভিপ্রায় সরকারের নেই (অমৃত বাজার পত্রিকা, 25 মে, 1981)।

উদ্যোক্তরা সম্মেলনটিকে তাদের যাত্রারম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই আন্দালনকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এই প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রগতিশীল ধ্যানধারণা সম্পন্ন প্রতিটি সংগঠন ও ব্যক্তির।

---

(1) ভারত সরকার 1974 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রী জয়সুখলাল হাতির সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও প্রকাশকদের নিয়ে একটি ভেষজ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন, যা হাতি কমিটি নামে পরিচিত। ভেষজ শিল্পে বহুজাতিক সংস্থার শোষণের অবসান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়ে কমিটির বিস্তারিত রিপোর্ট 1975 সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় এবং এতাবৎ সরকারী ঔদাসীন্যে তো পুর্বতন কমিটিসমূহের সুশারিশের ন্যায় ফাইলবন্দী হয়ে আছে। সূত্রঃ 'ভারতীয় ভেষজশিল্পে বহুজাতিক রাহুর ছায়া'—ডঃ সমর রায়চৌধুরী।

2। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1981 সংখ্যায় 1974-76 সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই অপপরীক্ষাদ্বয়ের সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

—সুখময় ভট্টাচার্য
13/4 সেণ্টাল পার্ক কলিকাতা—700032

জানবার কথা । নিউট্রন বোমা জিনিসটা কি ?

পরমাণুবেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসের শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য রূপে পেতে হলে দুটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটিকে কাজে লাগানো যায়—'ফিশন' বা বিভাজন, আর 'ফিউশন' বা সংযোজন। ফিউশন এর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পাওয়া এখনো সম্ভব হয় নি ('বি-ও-বি' জানু-ফেব্রু 1982 দ্রষ্টব্য), কেবল বিস্ফোরণই ঘটানো গেছে এর সাহায্যে। এই বিস্ফোরণের জন্য লাগে উচ্চ তাপমাত্রা যার জন্য আবার প্রাথমিক একটি ফিসন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নেওয়া হয় ('লেসার' রশ্মির সাহায্যেও ফিউশন ঘটানো সম্ভব, 'বি-ও-বি' জুলাই-আগস্ট 1981 দ্রষ্টব্য)। এখন ফিসন আর ফিউশনের ভিতর অন্যতম তফাৎ হল, প্রথম ক্ষেত্রে শক্তি বেরিয়ে আসে প্রধানত বিস্ফোরণ ও তাপ রূপে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে তুলনায় নানারকম তাৎক্ষণিক বিকীরণ (যার ভিতর দ্রুতগামী নিউট্রন কণিকা প্রধান) বা 'প্রমপ্ট রেডিয়েশন' এর শক্তি বেশী থাকে। এছাড়া থাকে কিছু বিলম্বিত বিকীরণ বা 'ফল-আউট', যার মাত্রা ফিশনের ক্ষেত্রে বেশী। তাহলে সাধারণ ফিউশন বোমা বা 'হাইড্রেজেন বোমা'র বিধ্বংসী ক্ষমতা আসে কোথা থেকে? এই বোমায় ফিউশনের মাল-মশলা ঘেরা থাকে ইউরেনিয়াম-238 এর এক আচ্ছাদন দিয়ে, যার ফলে ফিউশন থেকে শেষের পর্যায়ে ঘটে আর এক দফা ফিসন। দ্রুতগামী নিউট্রনগুলি শোষিত হয় এই আচ্ছাদনে আর বেশীর ভাগ শক্তি বেরিয়ে আসে বিস্ফোরণ ও তাপ হিসেবে। মার্কিন বিজ্ঞানী কোহেন পরিকল্পিত নিউট্রন বোমা আসলে একটি ফিউশন বোমা, কিন্তু এতে ইউ-238 এর ঐ আস্তরনটি নেই। ফলে কম বিস্ফোরণেই অনেক বেশী পরিমাণ দ্রুতগামী নিউট্রন বেরিয়ে আসে এ থেকে। অর্থাৎ এই বোমার উদ্দেশ্য বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস সাধন ততটা নয় যতটা নিউট্রন রশ্মির সাহায্যে প্রাণহানি ঘটানো। দেখা গেছে 8,000 র‍্যাড ('র‍্যাড' তেজস্ক্রিয়তার একটি একক) বিকীরণ যে কোন মানুষকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে পারে। একটি 1 কিলোটন শক্তির ফিসন বোমা 375 মিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় 8,000 র‍্যাড বা তার বেশী মাত্রার বিকীরণ। 10 কিঃ টন ফিসন বোমার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব হল 630 মিঃ। আর একটি 1 কিঃ টন নিউট্রন বোমায় 850 মিটার দূরেও 8,000 র‍্যাডের বেশী বিকীরণ পৌছয়। 8,000 র‍্যাড ত' হ'ল সর্বোচ্চ সহনসীমা। মাত্র 150 র‍্যাডেই 10% ক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। 1954 সালে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালিয়েছিল তা থেকে এই দ্বীপের অধিবাসীদের শরীরে পড়ছিল মাত্র 14 র‍্যাড বিকীরণ। তাতেই তাদের মধ্যে ক্যান্সার, লিউকিমিয়া ইত্যাদি দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এ থেকে আঁচ করা যায় নিউট্রন বোমার বীভৎসতা। একটি ফিশন বোমা থেকে মোট যতটা শক্তি বেরোয় তার মাত্র 5% বেরোয় তাৎক্ষণিক বিকীরণ রূপে। আর 50-50 মিশ্রণের একটি নিউট্রন বোমায় (অর্থাৎ যার বিস্ফোরণ ক্ষমতার অর্দ্ধেক ফিসনের আর বাকি অর্দ্ধেক ফিউশনের দরুন উদ্ভূত) তাৎক্ষণিক বিকীরণের ভাগ 30%। নিউট্রন বোমায় ফিউশনের ভাগ 50% না হয়ে 70 বা 75% পর্যন্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর প্রাণহরণ ক্ষমতা হবে আরো অনেক বেশী।

হাঁচি টিকটিকি বাধা

যে মানে সে গাধা

জনৈক শুভার্থীর সৌজন্যে

পরিক্রমা

একটি দরদী দৃষ্টিভঙ্গী। আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধী মানবিক ও গঠনমূলক মনোভাব সত্যিই বিরল। তাই ভালো লাগে যখন গত 9ই নভেম্বর রোমে আমাদেরই প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় যে মানবজাতির মৌলিক সমস্যাগুলির প্রতি আরো অনেক বেশী জোর দেওয়া উচিৎ। তিনি বলেন যে একটিমাত্র আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র বানাতে যা খরচ তাতে দশ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া যায়, অথবা পাঁচ কোটি অর্দ্ধভুক্ত শিশুকে খাদ্য দেওয়া যায়, অথবা পঁয়ষট্টি হাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায়, অথবা তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার প্রাথমিক স্কুল খোলা যায়। প্রধানমন্ত্রীর এই দরদী দৃষ্টিভঙ্গীটুকু না থাকলে আজ আমাদের অবস্থা কি হত ভাবতেই ভয়ে শিউরে উঠতে

স্বাস্থ্য নয় যুদ্ধ।

ভারত এখনো মারণাস্ত্র তৈরীর খেলায় মাতেনি—অন্তত সরকারী সূত্রে তাই বলা হয়। তাই বলে এদেশে সামরিক গবেষণার কৌলীন্য কিন্তু ক্ষুন্ন হয়নি। গত বছর (1981-82) ডিফেন্স্ রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অর্গানাইজেশন আর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ গবেষণা খাতে দাবী করেছিল যথাক্রমে 87·51 এবং 0·24 কোটি টাকা !!

(সূত্র: Govt. of India, Demand for Grants : 1981-82 ; March 1981)

গবেষণা না আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ?

এ বছরের গোড়ায় দিল্লীতে ও কলকাতায় স্বাস্থ্যগবেষণার বিষয়ে দু'টি বড় মেসিনার হওয়ার কথা ছিল। দুটি মেসিনারই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উপর থেকে পাওয়া নির্দেশমাফিক তা, এরকম সেমিনার ত' কতই হয়। আরো দুটি সেমিনার হ'ল কি হ'ল না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি জিজ্ঞাসা করতে পারেন অনেকে। ঠিকই, মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তবে এই বন্ধ হওয়ার সূত্র ধরে ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে চাঞ্চল্যকর এমন কিছু তথ্য যাতে যে কোন সুস্থ মানুষের রাতের ঘুম নষ্ট হবে। এদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার কয়েকটি দিকের উপর নাকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিল 'র' (রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিকাল উইং) ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। আর তারই ভিত্তিতে নাকি এই সিদ্ধান্ত। প্রকাশ, ভারত বংলোদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান জুড়ে বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে মার্কিন সহয়তায় মার্কিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে যে গবেষণা চলছে তার এক বড় অংশ আসলে এই উপমহাদেশে রোগ আর মহামারী ছড়িয়ে দেওয়াই এক গভীর ষড়যন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গত কয়েক বছরে এদেশে, বাংলাদেশে পাকিস্তানে এ ধরনের বেশ কয়েটি কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ও একাধিক মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ' এই দেশগুলি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। 1975 সালে এদেশে লোকসভায় প্রয়াত সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর নেতৃত্বে পাবলিক একাউন্টস কমিটি তার 167-তম রিপোর্টে এই ষড়যন্ত্রের এক আংশিক রূপরেখা তুলে ধরেছিল ('বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সেপ্টেম্বর অক্টোবর 1979, রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টটি এবং এ জাতীয় অন্যান্য তথ্যগুলি সাধারণ মানুষ প্রায় জানতেই পায় না। এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ ও শাসন কায়েম রাখার জন্য চালায় সাধারণ মানুষকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে রাখার 'গবেষণা' তথা প্রচেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রতিপদে আত্মসমর্পন ক'রে কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সেমিনার বন্ধ করে এ প্রচেষ্টা কতটা রোখা যাবে ভাববার বিষয়। (সূত্র : ব্লিৎস্, ফেব্রুয়ারী 27, 1982)

ম্যালেরিয়া বাড়ছে বিপজ্জনকভাবে।

কলকাতায় এবছর আগস্ট মাসের মধ্যেই 3,000 জনের ম্যালেরিয়ার খবর পাওয়া গেছে হাসপাতালগুলি থেকে। আরও কত ম্যালেরিয়ার রুগী হাসপাতালে দেখান নি তার হিসেব কেউ জানেন না। সাম্প্রতিক কালে এ রাজ্যে তথা সারা দেশে ম্যালেরিয়ার দ্রুত প্রকোপ বৃদ্ধি অনেকের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে দুশ্চিন্তা কেবল আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ মানুষের। দুশ্চিন্তা নেই এইসব দেশের প্রশাসনযন্ত্রের হোমরা-চোমড়া আমলাদের (এঁরা ম্যালেরিয়া ঠেকাবার নামে গাদা গাদা কমিটি করেই খুশী)। আর দুশ্চিন্তা নেই পৃথিবীর সব চাইতে বড় বড় রাসায়নিক ও কীটনাশক তৈরীর কারখানা গুলির মালিকদের। এরা আজ মশার প্রাদুর্ভাব আর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ার জন্য অনেকটা দায়ী। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটানোর জন্য এদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। এদেরই বিনিদ্র প্রচেষ্টায় সারা পৃথিবীতে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। এবং এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মশার নতুন নতুন প্রজাতি যার ডি-ডি-টি বা অন্যান্য কীটনাশকে আর মরছে না। কোন জায়গায়

মাত্র একবার ডি-ডি-টি বা ঐ জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করলে সেখানে মশাদের ভিতর ঐ কীটনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা আশী শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, পরিবেশে এক কিলোগ্রাম কীটনাশক ছড়ালে 105 টি ম্যালেরিয়ার ঘটনা দেখা দিতে পারে (সূত্র : স্টেট্‌সম্যান 28/11/81 ও 23/11/81)।

কীটনাশক না জননাশক ?

কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার আজকের দিনে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ এক জটিল সমস্যা ও বিপদের সৃষ্টি করছে। ভারতে কীটনাশকের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম—পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় মাত্র ছ' ভাগের এক ভাগ। তবু এদেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের চূড়ান্ত উদাসীনতার জন্য কীটনাশক ব্যবহারের বিপদ অন্যান্য অধিকাংশ দেশের চাইতে অনেক বেশী। প্রত্যেক ভারতীয় প্রতিবার খাবার খাওয়ার সাথে সাথে গড়ে 0·266 মিলিগ্রাম ডি-ডি-টি উদরসাৎ করেন, যার দরুন অ্যালার্জি থেকে হৃদরোগ বহু ব্যাধি হতে পারে, এমনকি মানসিক রোগ পর্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়। স্বভাবতই গরীব চাষী ও কৃষিমজুরদের ভিতরই কীটনাশকের বিষক্রিয়া সব চাইতে বেশী কারণ এঁদেরই হাত দিয়ে কীটনাশক ব্যবহৃত হয় অথচ এর বিষক্রিয়া সম্পর্কে এঁদেরকে জানানো হয় না কিছুই। কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বছরে গড়ে যে পাঁচ লাখ লোক অসুস্থ হন ও তিন হাজার জন মারা যান তাঁদের বেশীর ভাগই কৃষিমজুর।

কীটনাশকের বিপদ সম্পর্কে কৃষিমজুর থেকে শুরু ক র সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে নিজেদের উদ্যোগে। সরকার বা প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে কিছু আশা করা যে কতখানি মূর্খতা তার প্রমাণ পাওয়া গেল অস্ট্রেলিয়া থেকে বিষাক্ত কীটনাশকযুক্ত গম আমদানির ঘটনায়। সব জেনেশুনেও ভারতীয় জনসাধারণের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টন বিষাক্ত গম কিনলেন সরকারী আমলারা। (সূত্র : স্টেটসম্যান 2 রা ও 3 রা মার্চ, 1982)।

মনোরোগীদের হাজত ছেড়ে নতুন ঠাঁই

আমাদের দেশের মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষেরা যেন পরিবার, পল্লী ও রাষ্ট্র সকলেরই অহেতুক বোঝা। যে কোন প্রকারে এদের দায়িত্ব এড়াতে সকলেই ব্যস্ত। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এদের জন্য কোন সুস্থ পরিবেশে ঠাঁই কিংবা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দিতে অক্ষম আমাদের রাষ্ট্র একটি সরল সমাধান বার করেছিলেন। দরিদ্র পরিবারের কোন রোগী খুব ঝামেলা করলে—দাও জেলে পুড়ে। প্রত্যাশা নিষ্ঠাবান পুলিশ বাহিনীর অবিভাবকত্বে এবং আপ্যায়নে এরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকবে।

—জেল চত্বরে এদের প্রতি নির্দয় আচরণ দেখলে যে কোন সুস্থ মানুষই আঁতকে উঠবেন। তবে আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এদের জন্য ভিন্ন ঠাঁই গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন সম্প্রতি।

তবে নিশ্চিত হতে পারা যায় না এগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, বিশেষ করে চল্‌তি গোটাকয়েক মানসিক হাসপাতালের হালচাল দেখে। আসলে সবই ব্যর্থ হবে যদি এই রোগ ও রোগীদের প্রতি দৃষ্টিভংগিটাই না বদলায়।

জলের ভাবনা

1981 থেকে 1990 সাল পর্যন্ত এই দশকে দুনিয়ার তাবৎ দেশের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে পানীয় জল এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা—এই শপথ নিয়েছে বিশ্বসংস্থা রাষ্ট্রসংঘ। এদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে সারা পৃথিবীতে গড়ে দৈনিক 30 হাজার মানুষ মারা যায় পানীয় জলের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে। চীন বাদে উন্নতিশীল দেশগুলির 57 শতাংশ মানুষের জন্য কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, আর কোনরকম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই 75 শতাংশ মানুষের।

যদি এর ন্যূনতম সুযোগও পৌঁছে দিতে হয় শুধু ভারতবর্ষের মানুষদের কাছেই—সেজন্য এই দশ বছরে প্রয়োজন পনের হাজার কোটি টাকা, আর সারা পৃথিবীর লোকের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা। —প্রশ্ন হ'ল কোথা থেকে আসবে এই টাকা, প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও মালমশলা ? —ভাবুকরা ভাবতে বসেছেন।

তবে জলের জন্য অর্থের অভাব বলে সত্যিই অর্থের অভাব আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ এই দশকে সবার জন্য জলের ব্যবস্থা করতে যেখানে দৈনিক আনুমানিক 70 কোটি টাকা সংস্থান করতে মাথায় হাতদিয়ে বসে পড়েছেন বিশেষজ্ঞেরা সেখানে এই পৃথিবীতেই সমরাস্ত্র সজ্জায় খরচ হয় **দৈনিক 1200 কোটি টাকা !!**

মনোবিজ্ঞানীর বিচার

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে মনোবিজ্ঞানকে ব্যবহার করার অভিযোগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই শোনা গিয়েছে। এটি বন্ধ করার জন্য এবং কোথায় কি ভাবে এই অপব্যবহার হচ্ছে তার উপর নজর রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় কিছু সংস্থা রয়েছে। মস্কোর এমনই এক সংস্থার পরামর্শদাতা মনোবিজ্ঞানী ছিলেন ডাঃ আনাতোলি করিয়াগিন। এঁকে বিচারের জন্য আটক করা হয়েছে গত জুন মাসে। ডাঃ করিয়াগিন বিভিন্ন রুশ হাসপাতালে 17 বছর ধ'রে মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসকতায় রত ছিলেন। রুশ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী যে সব ব্যক্তিদের মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রাখা হয় তাঁদের কিছু 'কেস' পরীক্ষা করে তিনি দেখেন যে এঁদের আসলে কোন মানসিক বৈলক্ষণ্য নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃত পত্রিকা 'ল্যান্সেট'এর গত এপ্রিল সংখ্যায় ডাঃ করিয়াগিন এই ধরনের কয়েকটি 'কেস'-এর উপর তাঁর

বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলেন। এগুলির ভিতর অনেক 'রোগী'কেই কয়েক সপ্তাহ বা মাস আটকে রাখার পর কোনরকম চিকিৎসা না করেই ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। ডা: করিয়াগিন তারপর নিজেই আটক হন বিচারের জন্য। তাঁর আগেই আটক হয়েছিলেন উপরোক্ত সংস্থার অন্যান্য সব সদস্য। সংস্থাটি স্থাপিত হ'য়েছিল 1977 সালে। (সূত্র 'নেচার', খণ্ড 291, 11 জুন 1981, পৃ: 44)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবের লোকেদের মানসিক রোগী ব'লে আটক ক'রে রাখার পদ্ধতিটি সোভিয়েত সরকার 1966 সাল থেকে নিয়মিত প্রয়োগ ক'রছেন। (শিপ্রা সরকার, "সোভিয়েত রাষ্ট্রে অন্যমত", বারোমাস, নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1981)।

সন্ধানী।

পর্যালোচনা

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সারের ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা তীব্র। জমির দিক থেকে সারা ভারতের 2· % কিন্তু লোকসংখ্যার দিক থেকে ভারতের 8% রয়েছে পশ্চিমবাংলায়। আবার এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য-উৎপাদনের হারকে টপ্‌কে যাচ্ছে। কাজে কাজেই ক্ষেত থেকে আরও বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য চাই। কিন্তু আমরা আবার কৃষিযোগ্য জমির ব্যবহারিক সীমামাত্রায় চলে এসেছি ফলে একই পরিমাণ জমি থেকে আরও বেশী খাদ্যশস্যের উৎপাদন দরকার। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা (Productivity) বাড়ানো ছাড়া অন্য রাস্তা খোলা নেই। এটা করতে হলে পুরো কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা দরকার। সামাজিক বিধিব্যবস্থা পাল্টানোর সাথে সাথে প্রকৃতিবিজ্ঞানগত কিছু পরিবর্তন অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দরকার হচ্ছে বীজধান যেগুলির ফলন বেশী, আরও বেশী সেচ, পর্যাপ্ত পরিমাণ সার, কীটনাশক ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই আধুনিকীকরণের স্লোগান কিন্তু নতুন নয়। কিন্তু হয়েছে কতটা? পশ্চিমবংগের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের প্রায় 75%-ই ধান। আমাদের দেশে গত সত্তর বছরে ধানের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে মাত্র 2% কিন্তু জাপানে বিগত পঞ্চাশ বছরে ঐ একই সূচকটি বেড়েছে 100% এর ওপরে। তাহলে আমাদের দিক থেকে সাংঘাতিক গলদ বা ঘাটতি একটা কোথাও আছে।

এই পরিস্থিতিতে ডঃ শক্তিপ্রসাদ ধুয়ার "পশ্চিমবংগের কৃষিতে সার ব্যবহার" (পশ্চিমবঙ্গ পরিচয় গ্রন্থমালা – দুই, সমতট প্রকাশনী; দাম আড়াই টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা বাইশ) বইটি খুবই প্রাসংগিক। কারণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সংগে সারের বেশী ব্যবহারের যোগাযোগ একরকম অচ্ছেদ্য। কিন্তু গোটা বইতে ঐ 'গলদ বা ঘাটতি'র দিকের কথা আদৌ জোর বা আমল পায়নি। তাহলেও লেখক কিছু তথ্যপূর্ণ বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন সরল ভাষায়। গোটা বইটি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক দেখিয়েছেন পশ্চিমবংগে সার ব্যবহার কি ভাবে বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির সিংহভাগ যাচ্ছে বোরোধানের জন্য—আমন ধানে সুবিধে হচ্ছে না, এই দিকটা আরও জোরালো ভাবে রাখা যেত। জমির পরিমাণ হিসাবে সার ব্যবহারের যা সম্ভাবনা পশ্চিমবংগ কেন তার থেকে পিছিয়ে আছে তার আলোচনা আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে: কিন্তু এই অংশে মাটির চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জমির নাব্যতা অর্থাৎ উঁচু-নীচু জমির বিবরণের দিক কম গুরুত্ব পেয়েছে। এই পরিচ্ছেদে সামাজিক পটভূমিকার গুরুত্ব প্রশংসনীয়ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনার বিষয়বস্তু কোন ধরনের সার ব্যবহার করা উচিত। এই পরিচ্ছেদ-টি আরও বিস্তৃত হওয়া উচিৎ ছিল। জৈব সার, জীবাণু সার, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এগুলির ভূমিকা প্রায় বাদ পড়ে গেছে। অনেকে বলেন উপরোক্ত ধরনের সার কখনই রাসায়নিক সারের সমতুল্য নয়। কিন্তু সত্যিই কি এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে? নাকি, রাসায়নিক সার ব্যবহার যাতে অসার না হয় সেজন্য এমন ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে? এদিকটার আলোচনা প্রয়োজন ছিল। "পশ্চিমবংগের মাটিতে সারের অপচয় ও সঠিক ব্যবহার" এই চতুর্থ পরিচ্ছেদটি ভালই এবং কৃষিকর্মীদের কাছে খুব জরুরী।

গোটা বইতে বৃহত্তর কোনো লক্ষ্য (যেমন খাদ্যসমস্যার বিশ্লেষণ) প্রতিফলিত হয় নি। খাদ্য উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিত দূরে রেখে শুধু রাসায়নিক সার নিয়ে আলোচনা করলে তাৎপর্যের বিচারে তা খাটো হয়ে যায়। তবুও রাসায়নিক সার নিয়ে লেখার ব্যাপারে লেখকের পরিশ্রমের কিছুটা মূল্য আছে কারণ তাঁর বক্তব্য খুবই তথ্যনিষ্ঠ। ফাঁকা তত্ত্বের কচকচির বদলে সঠিক তথ্য যোগানোর মূল্য সময়বিশেষে অনেক বেশী। তবে লেখক ইচ্ছে করলে তাঁর লেখাকে আরও পূর্ণাংগ করতে পারতেন। অনেক প্রসংগ তোলাই হয়নি আবার কিছু কিছু প্রসঙ্গ প্রয়োজন মত গুরুত্ব পায়নি। এইরকম কিছু প্রসংগের কথা আগেই বলা হয়েছে; মনে হচ্ছে অন্তত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ একেবারেই বাদ পড়ে গেছে। এটি হ'ল পশ্চিমবংগে মাটির পরিমাণ অনুযায়ী রাসায়নিক সার ব্যবহারের যা সম্ভাবনা আছে, তার কতটা কাজে লাগানো সম্ভব এবং বিধেয় সে বিষয়ে আলোচনা। তাছাড়া, এখন পর্যন্ত

যতটুকু ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে, তার থেকে বেশী ব্যবহার সম্ভব কি ভাবে? এই প্রসংগেই এসে যায় অধিক ফলনশীল (HYV) বনাম দেশীয় উন্নত ধানবীজ (IIV) ব্যবহারের বিতর্ক। IIV র চাষে খরচা কম লাগে, পরন্তু একটা মাঝারি মাপের নিশ্চিত উৎপাদন পাওয়া যায় বলে এই বীজের ব্যবহারের প্রবক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবসার দিক থেকে এই বীজ ব্যবহার মোটেই কাম্য নয়। কারণ IIV চাষের ক্ষেত্রে পরিমাণে রাসায়নিক সার কম লাগবে। তাই সার-ব্যবসায়ীর গুদামঘর থেকে বন্দিনী লক্ষ্মী দেবী মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যাবেন। তাই ভয় হয় IIV র শেষ আশ্রয়স্থল হয়ত হবে কিছু-লোকের উর্বর মস্তিষ্কে! যাই হোক, সার ব্যবহারের প্রসঙ্গে এই HYV বনাম IIV বিতর্কের স্থানপ্রাপ্তি খুব ন্যায্য হত বলে মনে হয়।

পুস্তিকাটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। তবে দাম পৃষ্ঠাসংখ্যার তুলনায় একটু বেশী।

সুনীল মুখার্জী।

গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি এবং কেন?

[**গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন?**—সম্পাদনা: মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। প্রকাশক—অমূল্য মণ্ডল, বি-6/119, কল্যাণী, নদীয়া। মূল্য 50 পয়সা। জানুয়ারী 1982। পৃষ্ঠা সংখ্যা 20।]

পুস্তিকাটির সম্পূর্ণ নামকরণ "সমাজবিপ্লবে বিজ্ঞান: গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন? একটি প্রাথমিক খসড়া।" এরকম একটি পুস্তিকা সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয়—পুস্তিকাটি কিনুন ও কেনান, পড়ুন ও পড়ান। মূল্য যৎসামান্য, সাক্ষর মধ্যবিত্তদের ক্ষমতার মধ্যে।

সত্যি বলতে কি,—বিজ্ঞান বলতে যাই বোঝাক না কেন, গণবিজ্ঞান আন্দোলন বলতে যাই বোঝাক না কেন, এগুলো নিয়ে এখন কিছু প্রাথমিক আলোচনা অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। দীর্ঘদিনের বাংলা ভাষা রচনায় বিভিন্ন গণআন্দোলনের সমস্যাসঙ্কুল কিন্তু বিভ্রান্তিকর, প্রয়োজনীয় কিন্তু একঘেয়ে আলোচনার মধ্যে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারণা এবং কর্মসূচীর প্রবেশে খানিকটা মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের সম্ভাবনা আছেই। বিশেষতঃ আমরা যখন অন্তত দুটি জিনিস হারাতে বসেছি—তথ্যভিত্তিক ও নিরপেক্ষ বিচারের দর্শন, এবং তার সাথে কোনওভাবে সমস্যাজর্জরিত বিপুল জনসাধারণের স্বার্থে নিঃস্বার্থ ও দলমতনির্বিশেষে কাজ করার আগ্রহ। তাই, চিন্তা-ভাবনার ও কাজের নতুন সজীব প্রেরণাকে স্বাগত জানাই।

পুস্তিকাটিতে কোন লেখক বা লেখকগোষ্ঠী বা অন্য কোনও গোষ্ঠীর নাম নেই। সম্পাদক যার বা যাদের লেখাই সম্পাদনা করুন না কেন, পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই এসে পড়ে। তাই হয়তো পাঠকের বুঝতে বা বোঝাতে অসুবিধা হবে, কারণ এখনও গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের মত ও পথ এতো সুনির্দিষ্ট নয় যে এটা নিছক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ গ্রাহ্য ব্যাপার বলে ধরা যেতে পারে। পুস্তিকাটিতে প্রায় আঠারো পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা, মোট চোদ্দটি ভগে ভাগ করে। বিচিত্র ও বিপুল বিষয়ের এই আলোচনা, অল্প পরিসরে খুব স্বাভাবিকভাবেই অতি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই মনে হতে পারে বিষয়বস্তুর সংখ্যা কমানো অথবা পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। 'মনে হতে পারে'—কথাটি বলছি, কারণ বিষয়বস্তুর সম্পর্কে মতামত একান্তই পর্যা-লোচকের ব্যক্তিগত। অন্যান্য মতামতের জন্য তাই পরামর্শ দিয়েছি—পুস্তিকাটি পড়ুন।

পর্যালোচকের নিজস্ব মতামতও দীর্ঘ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, কারণ যেহেতু বিষয়বস্তু অসংখ্য। স্বল্প পরিসরে অবশ্যই এ পর্যালোচনা সম্ভব নয়। পুস্তিকাটির লেখকের স্পষ্ট কিছু বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যাবে—যেমন আধুনিককাল পর্যন্ত প্রচলিত বিজ্ঞানের ইতিবাচক শক্তি সম্বন্ধে (অন্ধকারকে উজ্জ্বলতায় ভরে দিতে পারে, পারে মানুষকে একঘেয়ে খাটুনি থেকে মুক্তি দিতে, কল্পনার স্বর্গকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে বিজ্ঞান"); গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মর্মবস্তু সম্বন্ধে ("বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান নয়, মানুষের বিশেষ করে ব্যাপক জীবনপিয়াসী শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান—এটাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মর্মবস্তু"); বিজ্ঞানের দ্বৈতচরিত্র সম্বন্ধে ("বিজ্ঞান শোষকশ্রেণীর হাতে অসাম্য ও উৎপীড়নের হাতিয়ার; সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের হাতে বিজ্ঞান শান্তি ও কল্যাণের সহায়ক") ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুস্তিকাটির সার্বিক আলোচনায় তাই মনে হয়েছে লেখক "বিজ্ঞান" বস্তুটির অভ্যন্তরীণ চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেননি, কিভাবে তার প্রয়োগ হয় সে সম্পর্কে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক, দুই চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন। বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস ঘাঁটলে হয়তো দেখা যাবে, প্রচলিত বিজ্ঞানের সমস্ত অর্জিত ফলের চরিত্রই হলো ব্যাপক অংশের মানুষকে শোষণ। আখের ছিবড়েটা হয়েছিলো বলেই সুদৃশ্য পাত্রে বিশুদ্ধ আখের রস পাওয়া গেছে। কোনভাবেই এই বিশুদ্ধ আখের রস ছিটিয়ে ছিবড়েটাকে আখ করা যাবে না। যেকোন আন্দোলনে খেয়াল রাখা উচিত আন্দোলনটি ছিবড়েতে রস ছেটানোর আন্দোলন কিনা। নিখুঁত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষা ও শিক্ষিতের অর্থনীতিটাই একটা দুষ্টচক্র—ব্যাপক অংশ বঞ্চিত ও ক্ষুদ্র অংশ লাভবান (Economics of Education, Vol, I, ed. N Blaug, 1972), বিশেষত দার্শনিকভাবেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্ভব শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা (The Human Essence: The Sources of Science and Art, by George Thompson, 1974)। এ হেন অবস্থায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব ব্যবহারে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে—

এটা প্রচুর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্দেহজনক ব্যাপার। অথচ বিগত বহু বছর ধরেই বিজ্ঞানের সমাজমুখী প্রয়োগের কথা বলা হয়ে থাকে (Scientific Research and Social Needs by Julian Huxley, 1934) বর্তমান পুস্তিকাটির মতোই। একাজটি করার জন্য 'বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠিত হয়েছে ('গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন?')- বোধ হয় তা নয়। প্রথাগত বিজ্ঞান চর্চার বাইরে অ-প্রথাগত (Non-formal) বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রচেষ্টা থেকে 'বিজ্ঞান ক্লাব' সংগঠনের উদ্ভব – এটা পশ্চিমবঙ্গ বা পাশ্চাত্যে সত্য। যদিও বর্তমানে শ্রমসাধ্য চেষ্টা চলছে এর চরিত্র বদলানোর। কাজেই যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠন সম্ভবত চরিত্রগত ভাবেই নতুন।

পুস্তিকাটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সম্ভাব্য কর্মসূচী।' আসলে, শুধু এই অধ্যায়টি নিয়েই একটী প্রথম পুস্তিকা হতে পারতো। হয়তো একথাটাই ঠিক – "গণবিজ্ঞান আন্দোলনে কি করতে হবে, কেমন করে করতে হবে, কোনটা করে কতটা কি ফললাভ হবে – এসব প্রশ্নের 'রেডিমেড' উত্তর আমাদের জানা নেই। কিছু করার পর অবস্থার পর্যালোচনা করে এগুনোই বৈজ্ঞানিক পন্থা বলে আমরা মনে করি।" কাজেই, মোটামুটি প্রাপ্ত বিজ্ঞানের ধারণা ও মালমশলা নিয়ে কিছুটা কাজ করতে নামার দিকে প্রথমে উৎসাহ পেলে ভাল হয়। কারণ, কাজকর্মের কিছুটা অগ্রগতি বা ভিত্তি অর্জন করলেই গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের ফ্যাশনদুরস্ত চেহারা বা কথাবার্তাগুলিকে বাতিল করা সম্ভব।

বিজ্ঞানশিক্ষা, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মধ্যে সম্পর্কটা ভালো করে, স্পষ্ট করে পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উদাহরণ হিসাবে পেশাগত বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানকর্মীর নাম পাওয়া গেল না। প্রশ্ন থেকে যায়—এই গণবিজ্ঞান আন্দোলনে তবে বিজ্ঞানকর্মিদের ওপর এতো জোর দেওয়া কেন?

কিছু মুদ্রণপ্রমাদ, আর বৃহৎ আলোচনার পটভূমিতে পুস্তিকাটির কিছু বিতর্কমূলক তথ্য ও তত্ত্বের কথা বাদ দিলে—বলতেই হয়, এরকম প্রকাশনার উদ্যোগে আমরা আগ্রহী। আর অনেকেই কিছু ভাবতে ও করতে প্রেরণা পাবে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা হয়তো গণবিজ্ঞান সম্পর্কে এই আহ্বান দিয়েই শুরু করবো—'দেশকে চিনুন, গ্রামের মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা জানুন ও বুঝুন'।

সৌমেন গুহ

রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সাধারণ সভা

গত 21শে ফেব্রুয়ারী, 1982 ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে (রাজাবাজার) পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কাজ পরিচালনা করেন সংস্থার সভাপতি শ্রীজয়ন্ত বসু। সংস্থার বিজ্ঞান আন্দোলন উপসমিতি ও পত্রিকা উপসমিতির পক্ষ থেকে কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করা হয়। দুটি রিপোর্টেই বলা হয় যে সংস্থার কাজকর্ম ঠিকমত প্রসার লাভ ক'রতে পারছে না। অবশ্য ন্যূনতম কয়েকটি কাজ সংস্থা নিয়মিত ভাবেই করে যেতে পারছে। পত্রিকার প্রচার খুব বেশী না হ'লেও গত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত পত্রিকা বেরুচ্ছে, এবং পাঠকদের কিছু প্রশংসাও পাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাসভা-গুলিও মোটামুটি সন্তোষজনক মানেরই হ'য়েছে। সংস্থা যে চারটি স্লাইড প্রদর্শনী তৈরী ক'রেছে (পানীয় জল, বন্যা, সূর্যগ্রহণ ও প্রাত্যহিক জীবনে বলবিদ্যা—এগুলির ভিতর প্রথম দুটি পঃ বঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে নির্মীত) সেগুলিও বহু জায়গায় দেখানো হ'য়েছে ও সমাদৃতও হ'য়েছে। তবে সংস্থা যদি বিজ্ঞান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায় তবে সক্রিয় কর্মীর অভাব মেটানো অপরিহার্য। সভায় বিভিন্ন বক্তা বিজ্ঞান আন্দোলনের তাৎপর্য ও তাতে সংস্থার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বিজ্ঞান আন্দোলনকে সম্মুখে রেখে সংস্থার কাজকর্মকে এক নতুন অভিমুখে চালিত করার বিষয়টিও আলোচিত হয়।

শ্রীসুব্রত পাল ব্যক্তিগত কারণে সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় সভা অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রী হরষিত মজুমদারকে বছরের বাকি সময়ের জন্য সম্পাদক মনোনীত করে। সর্বশ্রী লক্ষ্মী হাজরা, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, কুমারেশ মিত্র, শ্যামল দাস ও পিনাকী মুখার্জী আগামী নির্বাচন পরিচালক সমিতির সদস্য মনোনীত হন।

ষষ্ঠ নিখিল বঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞানশিবির—'82

গত 1-3রা ফেব্রুয়ারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দি সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের উদ্যোগে 'ষষ্ঠ নিখিল বঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির—'82'

অনুষ্ঠিত হ'ল। পরিচালক : শ্রী শুভব্রত রায়চৌধুরী। সহযোগী ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাব। এসেছিলেন মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, 24-পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং কুচবিহার জেলা থেকে বেশ কিছু প্রতিনিধি। দুদিন ব্যাপী আলোচনা চক্রে বিভিন্ন প্রতিনিধি গ্রামীণ বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং এলাকাভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প-বিজ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

শিবিরটি উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। মোট 52টি মডেল এই শিবিরে প্রদর্শিত হয়। চাতরার নন্দলাল ইনস্টিটিউশনের 'তাঁত বোনার যন্ত্র' বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদীপ ও বিজ্ঞান বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদকগণ প্রশংসাপত্র লাভ করেন। বিজ্ঞানগ্রন্থ পুরস্কার পান শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী 'আকাশের কথা' গ্রন্থের জন্য। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সৌজন্যে কুইজ, রচনা, বক্তৃতা ও মডেল প্রতিযোগিতায় 50টি পুরস্কার ও ফলক দেওয়া হয়।

গণবিজ্ঞান আন্দোলন—একটি অভিজ্ঞতা

সকাল প্রায় আটটার সময়ই আমরা রওনা হলাম—সব মিলিয়ে হয়তো পঞ্চাশ, কি ষাট জন। বর্ধমান জেলার করকোনা গ্রামে 30 জানুয়ারীর সকাল—পাশেই সরস্বতী পুজো বারোয়ারী তলায়। কলকাতা থেকে আমরা জনা বারো, অন্যান্য জায়গার আরো ক'জন, করকোনা গ্রামের খুব ছোটো ছেলে মেয়েরা, আর স্থানীয় ক'জন সংগঠক—রওনা হলাম। হাতে অনেক ব্যানার-পোস্টার বিজ্ঞান-বিষয়ক। শ্লোগান কয়েকটা ঠিক করা হয়েছিলো আগের রাত্রেই। সাথে ছিলো মাইক্রো-ফোনে গলা মিলিয়ে কয়েকটি গান। পথ দীর্ঘ নয়। গ্রাম চক্কর মেরে গিয়ে দাঁড়ালাম বিরাট বড় হাটে। পোস্টারগুলো মেলে ধরে দেখানো হলো, কিছু সাধারণ মানুষকে।

দুপুরে তরুণ সঙ্ঘের খেলার মাঠে কিছু পোস্টার টাঙিয়ে প্রদর্শনীর মতো সাজানো হলো। সন্ধ্যের পরেই শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—গান, আবৃত্তি, নাটক, স্লাইড-সহ 'বন্যা' ও 'সূর্যগ্রহণ' সম্পর্কে বক্তৃতা। আর এ সবের শেষে মাঠের মাঝখানের পর্দায় ফুটে উঠলো 'বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র।

শুধু বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে গ্রামীণ মানুষ খুব একটা উৎসাহ পাবে না জানাই ছিল। চলচ্চিত্র দেখানো হবে শুনে আমরাও প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু চমকে উঠলাম শিবের মাথায় জল ঢেলে 'বিলে'কে শান্ত করার ছবি দেখে। এতটা ঠিক ভাবতে পারি নি। এর আগে পর্যন্ত ভালোই লাগছিল পিপ্‌ল্‌স সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, কোটনিস স্মৃতিরক্ষা সমিতি আর অন্যান্য সংস্কৃতি সংস্থার তরুণ কর্মীদের সঙ্গে করকোনার অনুষ্ঠানে হৈ হৈ করে মিলে মিশে থাকতে। অবশ্য বিজ্ঞানের স্লাইড দেখানোর সময় টের পেয়েছিলাম কয়েকজন সংগঠকের অস্বস্তি—লোকে নাকি স্লাইডের প্রোগ্রাম নিচ্ছে না'। তাই লোকে যাতে 'নেয়' তার জন্যই বোধহয় আবির্ভাব ঘটানো হ'ল বিবেকানন্দের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার তিনেক মানুষ ফিরে গেল কুসংস্কারের গহ্বরে। বড় গভীর আর অন্ধকার এ গহ্বর।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কল্যাণীতে সতী মায়ের মেলা

গত 8ই থেকে 11ই মার্চ, 1982, কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় সতী মায়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয় অন্যান্য বছরের মত। মেলায় প্রায় দু' তিন লক্ষ লোক সমাগম হয়। এবারের বিশেষত্ব, বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠনের তরফ থেকে যৌথভাবে স্লাইড পোস্টার ও চলচ্চিত্র সহযোগে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি স্থানীয় যুবকদের যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়।

Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regn. No. WB/CC 113

With best compliments from

Messrs. Kalpana Engineering Private Limited

(Assisted unit of Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.)

Manufacturer of Air/Vacuum Brake System and spare parts for Locomotives and EMU Coaches of Indian Railways. Also manufacturer of Air/Hydraulic Brake System used in Vehicles for Defense Dept./Govt. of India.

OFFICE	:	8, Madan St. (1st floor), Suit No. 7, Calcutta-700072.
BRANCH OFFICE	:	Shibdaspur, DLW Road, Varanasi/U.P.
TELEPHONE	:	27-5008 (Office) 69-2236 (Factory)
GRAM	:	RAILBRAKE Howrah
FACTORY	:	J-46, Industrial Estate, Baltikuri, Howrah-5.

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে রূপলেখা 22 সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত।